মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে জীবনদর্শন

'দেশের অবস্থা' ও 'জাতীয় চরিত্র' সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়। "ঐতিহাসিক টেইন মনে বলেছেন সাহিত্য হল একটি বিশেষ কালের বিশেষ যুগের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ও সমকালীন ঘটনারই প্রতিবিম্ব।"[১] আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব প্রতিভা বিকাশের মূলে ক্রিয়াশীল থাকে। "জার্মান দার্শনিক কান্ট শিল্প-সৃষ্টির কথায় বলেছেন যে শিল্পীর প্রকৃত শক্তি নিহিত আছে তাঁর প্রতিভায়। আর এ-প্রতিভা হল কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগের ফল।"[২] শৈশব থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নানা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্পীকে মনের দরজা জানালা খোলা না রাখলে চলে না। এই অভ্যাস তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত অসুস্থতার মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল। সাম্প্রতিক বিশ্বে যে নব নব চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে তার সঙ্গে নিয়মিত যোগ রাখার আকুতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখত। তিনি নিবিড়ভাবে সেসব আত্মস্থ করতেন। সেগুলি সুনিপুণভাবে মিশে যেত তাঁর সৃষ্টির আঙ্গিকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যখন নাটক লিখতে শুরু করেন তখন বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ছিল জটিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকট নিয়ে জটিল আর্থ-সামাজিক আবর্তে নাটকের চরিত্রের আদল বদলে যায়। বদলে যাওয়া ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের নিরিখে শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনদর্শন ভাবনা। জটিল আবর্তে বাস্তব জীবনের বাইরে ব্যক্তিসত্তার অবচেতন স্তরের পরিচয় সন্ধানের প্রয়াস দেখা যায় শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে আধুনিকতার যে দর্শনের চর্চা হচ্ছিল তার ঢেউ লেগেছিল এদেশেও। সংবেদনশীল কবি ও নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় দর্শনে প্রভাবিত হয়েও তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে বাস্তবের চেতন স্তরের সঙ্গে অবচেতন স্তরের কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে নাটকের চরিত্র, বিষয়, আঙ্গিক

সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' ১৯৬৩ সালে 'গন্ধর্ব' নাট্য পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নাটকের বিষয় ভাবনার ভিত্তি স্থাপিত বিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঊষর ভূমিতে। মানুষের অবচেতন স্তরের পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গিয়ে এক জটিল ও ভয়ঙ্কর অদ্ভুত বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছেন নাটককার। যেখানে আপাত উদ্ভট কাহিনির অন্তরালে একজন শিল্পীর স্বপ্ন-ব্যর্থতার ইতিহাস ব্যাপ্ত। সদ্য কবিতার জগৎ থেকে নাটকের জগতে আসার ফলে তাঁর এ নাটকে কথা থেকে ক্রিয়া নিংড়ে নাটকীয়তা বিবৃত করেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। চার অঙ্কে সমাপ্ত এ নাটকের গঠন কৌশল। চারটি অঙ্কই কোন স্বতন্ত্র স্থানে ঘটমান নয়, এক ঘরেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। তবে তীব্রতর কাব্যিক আবেগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সেই ঘরেই কখনও নির্লিপ্ত কখনও বা অসহায় দমবন্ধ করা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। নাটকের প্লটের গঠন কৌশল কখনোই সেখান থেকে বিচ্যুত হয়নি বরং প্রতীকী বিস্তারে নাটকের মধ্যে তা সংসপ্ত আবেগ নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। নাটকের কাহিনিতে রয়েছে বেঁচে থাকার অসহনীয় পরিস্থিতির কথা। নাটকের কাহিনি আগন্তুক চরিত্রকে কেন্দ্র করে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। লোকটি মনে করে তার কণ্ঠনালীতে একটি সূর্য আটকে রয়েছে। এই দুরারোগ্য ব্যাধিকে লোকটি পৃথিবীর মৌলিক রোগ বলে উল্লেখ করে—

> "এটা পৃথিবীর প্রথম মৌলিক রোগ। আমার আগে কারুর হতে পারে না। তাছাড়া এ রোগটার সমস্ত কপিরাইটও আমার!"[৩]

অথচ লোকটির মনে হয়েছিল যে গলা থেকে সূর্যটা বেরানো উচিত কিংবা হৃদপিণ্ডের ভিতর গিয়ে ঢুকে থাকা দরকার ছিল। কণ্ঠনালীতে আটকে থাকা ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। গলায় সূর্য আটকে যাওয়ার অসুখটি অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির মস্তিস্ক বিকৃতির পরিচায়ক রূপে প্রতিভাত হয় অন্যান্য চরিত্রের কাছে। এই লোকটি আবার নিজেকে কুকুর ভাবে। লোকটির মনে হয় কুকুর ধরার দল সাঁড়াশি দিয়ে ধরবার জন্য তাকে

খুঁজছে– যা সহজেই লোকটির অস্তিত্বের অপূর্ণতাকে স্পষ্ট করে তোলে। লোকটির সংলাপ থেকে জানা যায়—অভাবে, লোভে, অপমানে, তাচ্ছিল্যে, অসম্মানের রাস্তায় কুকুরের মত চার পায়ে হাঁটছে সে। গায়ে তার ঘৃণ্য লোম, পায়ে ছুঁচালো নখ, দাঁতে ঈর্ষার বিষ। চারিদিকটা কামড়ে দিতে চায় সে। নাটকে ‘কুকুর’এর রূপকটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। একজন সাধারণ মানুষ জীবনের প্রতিটি ধাপে শোষিত, নিগৃহীত, উপেক্ষিত হতে হতে ঋজু মেরুদণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়াবার বলিষ্ঠতা ভুলে যায়। ‘চারিদিকটা কামড়ে দিয়ে’— সে প্রতিবাদ করতে চায়। অথচ প্রতিবাদের সঠিক পন্থা বা ভাষা তার আয়ত্ত নয়। কিন্তু প্রতিবাদের পথ অন্বেষণ করার ইঙ্গিত রয়েছে লোকটির সংলাপে— ‘আমি অনেক কথা জানি, মহৎ কথা জানি, ভয়ংকর কথা জানি– আমাকে বলতে হবে, নিশ্চয়ই বলতে হবে।’ ‘অন্ধকারের পৃথিবীতে’ যে অসুস্থতার তাণ্ডব চলছে তার সামনে লোকটি অসহায়, কিন্তু সে আশাহীন নয়। ‘মহৎ’ ও ‘ভয়ংকর’ কথা সে এই অন্ধকার বিদীর্ণ করে উচ্চারণ করবেই— দুবার ‘নিশ্চয়ই’ উচ্চারণে তার আত্ম প্রত্যয়েরই প্রকাশ ঘটেছে। ‘সূর্যটা’ ‘হৃদপিণ্ডের ভিতর’ থাকলে বেঠিক দুনিয়ার উপর আগুন উগ্রে দিতে পারত। কিন্তু সূর্যটা ভুল জায়গায় ‘কণ্ঠনালীতে’ আটকে গেছে— তাই সে ভীত, বিহ্বল। কিন্তু অপেক্ষা করছে একদিন প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠবেই। আবার লোকটি ঘৃণ্য কুকুরের মত আচরণের মধ্য দিয়ে প্রচার করতে চায় কুকুরের দর্শন, লোভের দর্শন, উপেক্ষার দর্শন, ক্ষোভের দর্শন। আর এই সকল দর্শনের প্রচার করতে চাওয়ায় তার মুখ থেকে অসংখ্য পিংপং বল অনর্গল পড়তে থাকে। সমস্ত ঘরে সেগুলি ড্রপ খেতে থাকে। টেবিল-চেয়ার, জানালা, রাস্তা, ল্যাম্পপোস্ট, লোকজন এমনকি গোটা পৃথিবী যেন পিংপং বলের মত ড্রপ খাচ্ছে। কাশির সঙ্গে অসংখ্য পিংপং বলের মত বুদ্বুদ বেরিয়ে আসে তার গলা থেকে। এগুলো সূর্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বলে মনে করে সে। কণ্ঠে আটকে থাকা সূর্যটিকে বের করার জন্য লোকটি ডাক্তারের কাছে আসে। ডাক্তার এরকম রোগের কারণ হিসেবে তীব্র মাদক সিগারেট, পান খাওয়ার কথা বলেন। কিন্তু

এ কথা বোঝা যায় যে জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে দুর্লভ আলোকিত সময়ের অবলোকনে সে যে সব সূত্র দেখেছে তাতেই সে জানে গলায় সাঁড়াশি ঢুকিয়ে চাপ দিলে ভেতর সূর্যটা বিরাট চাপে ফেটে যাবে। রক্ত লেগে লক্ষ লক্ষ সাদা পিংপং বল লাল টকটকে হয়ে সমস্ত পৃথিবী গড়াবে। একদিকে স্বপ্নের জগৎ শৈশবে ফিরে যাওয়ার দুরন্ত টান অন্যদিকে বাস্তবের চোখে দেখা পৃথিবীর আপাত সামঞ্জস্য ঘোরতর অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছে লোকটির। তাই তার সংলাপে বার বার আসে স্বপ্নের কথা, বাল্যকালে ফিরে যাবার আর্তির কথা। সময় ও বাস্তবতার ছককে নাটককার ভেঙ্গে ফেলায় লোকটির সংলাপ আপাত উদ্ভট মনে হয়। এই আপাত উদ্ভটত্ব আমাদের ছকবাঁধা সাজানো গোছানো জীবনে অতিশয়তার ইঙ্গিত দেয়। আগন্তুকের চোখে ধরা পড়ে স্বপ্নের মায়া কুহকের সকরুণ অবয়বের ফাঁকি। অথচ শৈশব থেকে সঙ্গে লেগে থাকা ভয়কেও সে অস্বীকার করতে পারে না। সে জানে এ কথাগুলি এই পৃথিবীর কাছে বলা অনর্থক। যারা নিজেদের পূর্বাপর স্বভাবগত ভাবে আজীবন বজায় রাখে, যারা গলার মধ্যে শরীরের মধ্যে কোন রক্তিম উত্তাপ অনুভব করে না। যাদের দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবন যাত্রায় স্বাভাবিকভাবে বছর ঘোরা আহ্নিক গতির আবর্তনের কোন ব্যত্যয় নেই, তাদের কাছে এই মানুষটির গভীরতর অসুখের কথা বলতে গেলেই ওরা তাকে মেরে ফেলবে। তারা লোকটাকে আরশোলার মত মেরে ফেলবে, হয়তো তার শরীরটাকে ঘিরে একরাশ উকুন উড়ে আসবে– একপাল শকুনও। কিন্তু লোকটি আরশোলার মত মরতে চায় না। তাই সেই ভয় কাটানোর জন্য আগন্তুক লোকটি তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মিলুর এই প্রস্তাব উন্মাদের প্রলাপের মত মনে হয়। লোকটি জানায় মিলুকে তার ভালো লাগার কথা। এর উত্তরে মিলুর সংলাপ কাব্যিক মাত্রা লাভ করে— 'ভালো তো আকাশটাকে লাগে, অমনি বিয়ে করতে হবে।' যদিও মানুষটির এই চাওয়া বা তার যাবতীয় কামনার মধ্যে কোন বস্তু জগতের উদ্দীপনার চিহ্ন নেই। প্রেমকে তার মনে হয়েছে 'মেটারিয়াল গেইনের' হাতিয়ার। তাই প্রেম ব্যাপারটা

লোকটির কাছে নিরাকার অ্যাবস্ট্রাকসনের বিষয় হয়ে ওঠে না। চরিত্রটির সংলাপে ধরা পড়ে-

> "তাছাড়া ভালবাসা থেকেই লোকসানের পরিণতি পৃথিবীতে সব থেকে বেশি। যখন যায় সব নিয়ে যায়- কিছু লাভ অন্তত থাকা দরকার। ... যে প্রথম ভালবাসতে যাবে তাকে অপর পক্ষের প্রয়োজন মতো একটা এনট্রি-ফি দেবার নিয়ম মেনে চলতে হবে। ধরুন আমার মতো লো-ভাইটালিটির রুগণ লোককে যদি কেউ ভালবাসতে চায় এনট্রি ফি হিসেবে আমাকে তার মালটিভিটামিন ফরটি তিনটে বড় ফাইল, বিজি ফস তিন ফাইল, এক কোর্স ক্যালসিয়াম ইনজেকশন; বছরে গোটা কয়েক পাঞ্জাবী, কয়েকটা ধুতি, খানকতক বই- এসব দেওয়া উচিত। কারুর হয়তো অন্যরকম দরকার। প্রয়োজন অনুসারে প্রবেশমূল্য আর কি। বাড়াবাড়িও হতে পারে, রেস্টুরেন্টে খাওয়ানো বা সিনেমা দেখানোও হতে পারে। এতে সুবিধে এই প্রেম চলে গেলেও এই সুবিধেগুলো থেকে যায় – ভালবাসা থেকে কিছু বাস্তব লাভ, মেটেরিয়াল গেইন আসে। তাছাড়া এরকম হলে প্রেম ব্যাপারটা অতো নিরাকার অ্যাবষ্ট্রাকসনের উপরেও থাকে না। দায়িত্ব আসবে, একটা স্পষ্ট দেনা পাওনার ব্যাপার এসে যাবে। কেবল শূন্য নিয়ে বিরহের ডুগডুগি বাজানোর করুণ বাজনাটাই শুনতে হবে না।"[৪]

অথচ সবকিছু ঠিক দেশের নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক অবনমন সত্বেও সে লোভ ছাড়তে পারে না। এই লোভের বশবর্তী হয়ে অনুর্বর, ধূসর, নিঃসঙ্গ বিষাদময় জীবনকে এড়াতে চেয়েছে সে— যে জীবনের চিন্তায় 'মাছি ঢুকে থাকে', 'রক্তে থাকে ছারপোকা' আর চোখের সামনে নৈরাশ্যজনক ভাবে পৃথিবী ভরে ওঠে পিংপং বলের বুদ্বুদে। নাটক

আর তার আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে কল্পলোক ও বস্তুলোকের দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষময় চিত্রকল্পগুলি উপস্থাপিত করেছেন বিবৃত সংলাপে। নাটকের সমাপ্তিতে দেখা যায় লোকটির জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধ মৌল সংঘাতেরই শিল্পরূপ—

> "অদ্ভুত নীল আলো ঘরে। মনে হচ্ছে বাইরের সমস্তই নীল। আমি চলে যাব। সেই টেনিস বলটা একটা বিরাট জাহাজের মতো ভেসে আসছে, আমাকে নিয়ে যাবে। আমি জাহাজের শব্দ শুনছি। আমি চলে যাব।"[৫]

সেই চলে যাওয়ার মধ্যে একটা পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। রাশীকৃত নিদারুণ শূন্যতায় জমে ওঠা হৃদয়ে মানুষটি যে মুহূর্তে চলে যাওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয় ঠিক সেই সময়েই ঘরের মধ্যে কালো পোশাক পরা লোক গুলো ঢুকে পড়ে। অর্ধবৃত্তের মত তারা ঘিরে থাকে মানুষটিকে— সেই প্রায় অন্ধকার নীল আলোর মধ্যে যেন মিশে যেতে থাকে মানুষটি। এভাবেই নিঃশেষিত হতে থাকে তার বেঁচে থাকবার, বেঁচে থাকার কাহিনি। আগন্তুক লোকটি নাটকের নায়ক। আসলে নায়ক স্বল্প প্রতিভাধর শিল্পী জীবনের গভীর সংকটময় পরিস্থিতিতে বিরাজমান। নায়ক তার শিল্পীসত্তায় সূর্যের মতো বিরাট কিছু প্রকাশ করতে চায় কিন্তু তা তার সাধ্যের বাইরে। সাধ্য আর অসাধ্যের সংকটের গভীরতম রূপক ব্যঞ্জনা হল কণ্ঠনালীতে সূর্য এবং পিংপং বলের বুদ্বুদ। এই রূপক কবি মোহিত থেকে নাটককার মোহিতের উত্তরণকেও ব্যঞ্জিত করে। নাটকে ব্যবহৃত ভাষা ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিমূর্ত হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার স্পষ্ট আভাস। নাটকের আখ্যানভাগে হাস্যরসের মিশ্রণ ঘটেছে। মিলুর প্রেমিক সমীর এবং ডাক্তার লাহিড়ী এই হাস্যরসকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। খাকি হাফপ্যান্ট, ফুল-হাতার টকটকে লাল গোলকিপারের মতো একটা গেঞ্জি ও কালো রঙের মুসলিম টুপি পরা সমীরের বিচিত্র রূপের বাহার দেখে মিলু খিলখিল করে হেসে ওঠে। এই বিচিত্র সাজ-পোশাকে সমীরের ভালোবাসার অসীম শক্তি অনুভব করে। তার মনে হয়—

" ভালবাসার কি অশুভ শক্তি। কেবল তোমার দুটি কোথায় এই চেহারায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারি, স্টেশন তো ঘরের দরজায়। ভালোবাসো যদি চায়, মেরুদণ্ড খুলে ফেলে ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, আরশোলা যা খুশি তাই হতে কোন লজ্জা নেই; ভালোবাসা যদি চায় সমস্ত ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ পোঁটলা করে মাথায় তুলে খালি গায়ে এসপ্ল্যানেডের মোড়ে খড়ম পরে নৃত্য পর্যন্ত করে যেতে পারি।"[৬]

শুধু তাই নয়, সমীর এই মহা সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যখন মিলুর বয়স পনেরো ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি। সমীরের সংলাপে তার প্রকাশ—

"আধ ফোটা কুঁড়ি তুমি দু'চোখে কাজল।

অলক দুলায় মোরে করেছ ছাগল।।"[৭]

বিচিত্র পোশাকে উত্তেজিত হয়ে সমীরের মনে কবিতা জেগে ওঠে। নাটককার এক অসাধারণ উপমায় উপমিত করেছেন সমীরের এই ভাবকে। সমীরের সংলাপে রয়েছে—

"গরম বালির মধ্যে যেমন করে খই ফুটতে থাকে তেমনি করে অজস্র কবিতা আমার মনের জাগছে। ব্যাঙের ছাতা খোলার শব্দের মত আমি তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।[৮]

সে কবিতা জাগরণের দুঃসহ অস্থিরতায় এক একদিন রাত্রে তার ঘুম আসে না। হাতের কাছে কাগজ আর কলম নিয়ে তাকে জাগতে হয়। মিলু তাকে ঘুমের জন্য ওষুধ খেতে বললে, সে ঘুমের ওষুধ খেয়ে সৃষ্টির যন্ত্রণা ও সৌন্দর্যের আরতি থামিয়ে নাক ডেকে ঘুমাতে পারবে না বলে জানায়। শিল্পী যে একজন পিতা, তার অনুভূতির মৃত্যু একটি সন্তানের মৃত্যুর সমান এরকম এক দার্শনিক উপলব্ধি সমীরের সংলাপ থেকে জানা যায়। তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মন্দিরের প্রদীপের মতো একাকিত্বের দর্শনের কথা।

তার প্রিয় কুকুর টমিকে নিয়ে লেখা কবিতা— 'টমি টমি টমি...' এর মধ্য দিয়ে হাস্যরস ও সংলাপের অযৌক্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। মিলুর জেঠামণি ডাক্তার লাহিড়ী চরিত্রে উদ্ভট কল্পনার পাশাপাশি হাস্যরসের উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে। হাওড়া স্টেশনে আনতে যাওয়া ব্যক্তিকে সহজে চেনার উপায় হিসেবে যে পোশাকের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তার যেমন অদ্ভুত তেমনি হাস্যোদ্রেককারী। তাঁর হিসেব করে সিঙ্গাড়া খাওয়া অদ্ভুত ঠেকে আমাদের কাছে। নাটকের আগন্তক লোকটি যেমন অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত তেমনি ডাক্তার লাহিড়ীর চিকিৎসা পদ্ধতিও আরও উদ্ভট। নাটক ঘটনার অগ্রগতিতে আরো অদ্ভুত এবং উদ্ভট বিষয় উঠে আসে আগন্তুক লোকটির সংলাপে। লোকটির বাবা ত্রিংশ শতাব্দী মত দেখতে। তার জন্ম তার পিতা-মাতার জন্মের পূর্বে হয়েছে বলে জানায়। লোকটি তার নিজের নাম ভুলে যায়। পায়ের তলায় বালি বড্ড গরম বলে তার বন্ধুবান্ধব উট ধরতে গেছে। লোকটির আত্মীয়-স্বজন অষ্টম পানিপথের যুদ্ধে মারা গেছে। তার কথায় যুদ্ধটা পঞ্চম কিংবা সপ্তম বা নবম হতে পারে। সে যুদ্ধ করেছিল 'গোলাপের' বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে কেউ জয়লাভ করে না। তার কাছে 'যুদ্ধই নিয়তি'। নাটকের কাহিনিতে পৌরাণিক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নামকরণটি রাহু কর্তৃক সূর্য গ্রহণের পৌরাণিক প্রসঙ্গকে স্মরণ করায়। লোকটির জন্মের প্রাচীনতার প্রসঙ্গে পৌরাণিক উপাদান স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> "একটা সমুদ্রে সমস্ত দেবতারা হাবুডুবু খাচ্ছে, কোন থাকবার জায়গা পাচ্ছে না। তারপর সেই অনাথ দেবতারা আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীরে ঢুকতে লাগল।... অগ্নি দেবতা বাক্ হয়ে মুখে, বায়ু প্রাণ হয়ে নাসিকায়, সমস্ত গাছপালা ত্বকের মধ্যে ঢুকে চুল আর রোমরাজি হল, দশদিক শব্দ হয়ে কানের মধ্যে ঢুকল, চন্দ্র মনে, অধঃবায়ু মৃত্যু নাভিপথে, রেতঃ জল রূপে শিশ্ন মধ্যে ঢুকল! আর সূর্য অক্ষিমণ্ডল থেকে সম্প্রতি কণ্ঠনালীতে এসে আবদ্ধ হয়ে আছে।"[৯]

এই নাটকে আপাত উদ্ভট কাহিনির অন্তরালে কাব্যধর্মী ভাষা সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অরক্ষিত সমাজব্যবস্থা ও খণ্ডিত মানবসত্তার বিচিত্র রূপ নাটককারের সূক্ষ্ম জীবনদর্শন প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া' ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত। নাটকের পরিচিতি বিষয়ে নাটককারের বক্তব্য উল্লেখ করা যায়—

> "সমগ্র নাটকটির পরিকল্পনা, কাহিনী ভাবনা, চরিত্র, সংলাপ মৌলিক তবে একটি শোনা বিদেশি কাহিনীর অতি সামান্য সাদৃশ্য বর্তমান নাটকটির একটি ছোট অংশের সিচুয়েশনের মধ্যে রয়েছে। এতে রচনাটির মৌলিক চরিত্র বিশেষ আহত হয়েছে বলে আমার মনে হয় নি।"[১০]

সোমনাথ, স্ত্রী মৃন্ময়ী, ছেলে বিমল, মেয়ে মিনু, চঞ্চল, একজন প্রৌঢ়, সুহাস, পর্ণা, মিঠু, একটি বাচ্চা ছেলে ও হ্যারি গোল্ডেন নামে একজন অ্যাংলো যুবক এই কয়েকটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। বাস্তব আর কল্পনার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এর কাহিনি পাঁচটি দৃশ্যে বিধৃত। নাটকের শুরু হয়েছে অদ্ভুত ভাবে—তাসের তৈরি দীর্ঘ মালা গলায় পরে কাঁচা পাকা চুলের একজন দেহ একটি রহস্যময় পরিবেশে একটা টুলের উপর পারিবারিক পরিচিত জনের সমাবেশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে প্রশ্ন তোলেন - আমরা হাসি কেন। সমাবেশে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্রগুলি সময় কাটানোর জন্য কোন বিষয় খুঁজে না পাওয়ায় এরকম বক্তৃতার আয়োজন শুরু করেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি। তাঁর কথায় সমাজের এক অদ্ভুত বিষয় ব্যক্ত হয়ে ওঠে-

"আমরা আসলে এক প্যাকেট তাস। কয়েকজন চারপাশ থেকে আমাদের সাফল করছে, ডিল করছে, চার হাতে লুকিয়ে তুলে নিচ্ছে, খেলছে। আমরা নিজেরা অর্থহীন চার পাঁচ টেক্কা গোলাম।"[১১]

সকল চরিত্রগুলি এক জায়গায় সমবেত হয়েছে সোমনাথ নামের এক পূর্ব পরিচিত অভ্যাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। মিঠু ও পর্ণা নামক সপ্রতিভ দুই নারী যৌবনে সোমনাথকে ভালোবাসত। নাটকে তিনটি প্রেমিক যুগলের কথা রয়েছে। মিঠু, পর্ণা, সোমনাথ এবং সুহাস এই চারজন চরিত্রকে কেন্দ্র করে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পর্ণা সোমনাথকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছিল। অন্যদিকে সুহাস ভালোবাসে পর্ণাকে, পরে তাকেই বিয়ে করে। পর্ণাকে কেন্দ্র করে সুহাস ও সোমনাথের সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে। অথচ কলেজে পড়ার সময় সুহাসের হাসি ভোরবেলার বাতাসের মতো সুন্দর ছিল। বিয়ে করার প্রায় এক বছর পর্যন্ত সে চমৎকার হাসতে পারত। ক্রমশ তা হারিয়ে যায় কোন এক পাপের ফলে। সুহাস মনে করে তাদের তিনজনের সমবেত কারণেই এই পাপ সঞ্চয় হয়েছে। তাই সোমনাথকে বলতে শোনা যায়—

"আমরা তিনজনে যদি মন্দির, পাহাড়, সমুদ্র বা আকাশের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই তাহলে আমরা তিনটে সবুজ পাতার মত কোনও ডালে একসঙ্গে আলো বাতাসে হয়ত এখনও বাস করতে পারি।"[১২]

সোমনাথের মনে করে অবিশ্বাস আর লোভ সুহাসকে মেরে ফেলেছে। নাটক শেষে দেখা যায় এই চরিত্রগুলি প্ল্যানচেটের মাধ্যমে সোমনাথের আত্মাকে আহ্বান করে মৃত্যুর পর তার অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য। নাটকের নায়ক বেসুড়ে প্রৌঢ় সোমনাথ এককালে নীলরঙয়ের ঘোড়ার স্বপ্ন দেখত। সেই ঘোড়া তাকে রেসের মাঠে টেনে নিয়ে যেত। সেখানেই তার 'হেলদি অ্যানিম্যালস আর মুভিং' অনুভবটা সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, চঞ্চল, ঘোড়ার সহিস হ্যারি গোল্ডেন এমনকি প্রৌঢ়

লোকটিও সোমনাথকে উৎসাহ দেয় খেলার মাঠে যাওয়ার জন্য। তার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী প্রাক্তন প্রেমিকা পর্ণাই তাকে মাঠে যেতে মানা করে। কিন্তু জীবনের স্বপ্ন তাকে ছাড়ে না, সোমনাথের সংলাপে প্রমাণ পাওয়া যায়—

> "নীল রঙের ঘোড়াটা আমাকে নিয়ে যাবে। আমার মুকুটে হীরে, মুঠোয় সোনা, জামায় আতর, পায়ে জরির জুতো।"[১৩]

সে স্পেকুলেশন করত রেসের মাঠে কোন ঘোড়া জিতবে। স্বপ্নের জগতের এক ছেলের দেওয়া রঙিন কাগজে লেখা থাকত রেসের মাঠে জেতা ঘোড়াগুলির নাম। এই স্বপ্নের জগতের ছেলের হাত ধরেই সোমনাথ পূর্বেই জানতে পারে রেসের ফলাফল। মাঠের রেস জিতে সোমনাথ বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। মাঠে রেস জেতা ও অর্থ লাভ সম্পর্কে ছেলে বিমলের মন্তব্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থসংকট থেকে মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার ইঙ্গিত রয়েছে—

> " মা, মাগো, তড়াং করে যদি ঘোড়াগুলো লেগে গিয়ে থাকে না! ফিরে গেলে আমাদের কপাল। কেন যে টাকাপয়সা সব জড়ো করে দিলে না বাবাকে! হিয়ার কাম্‌স মাই ফাদার, দিয়ে ফিউচার কিঙ্‌। দি টায়ার্ড ম্যাজিসিয়ান উইথ দি গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড !"[১৪]

সোমনাথের হিসেব করা সমস্ত ঘোড়াগুলি রেসের মাঠে জিতলেও তাকে হতাশ দেখায়। এরপর রেসের মাঠে যা ঘটবে সব তার জানা। জানতে পারাটাই তার বিবেককে দংশিত করে তোলে। তার মনে হয়—

> "কেমন যেন সিংহাসনে বসেও ভিখিরি ভিখিরি লাগছিল। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। নিজের মুখের মধ্যে জিভটা এতো তেতো লাগছিল।

> চারিদিকটা এতো অর্থহীন, মানুষের লোভের, লোকসানের চিৎকার এত ভালগার, উল্লাস এতো ডিস্টার্বিং। না আর না এ খেলা আর নয়।”[১৫]

‘দি টায়ার্ড ম্যাজিসিয়ানের’ মতো সোমনাথ সত্যি ক্লান্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজনা আর ক্লান্তিকে একটা যান্ত্রিক চাকার তলায় চাপা পড়ে যাওয়া এবং নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া বলে উল্লেখ করে সে। তার মনে হয় সে যেন ভেতরে ভেতরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এক এক সময় তার নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হয়। ভাবে কাঁধে যেন সে একটা ভারী বোঝা বইছে। তার বুকের মধ্যে একটা দানব যেন হাঁপাচ্ছে। সেটা কষ্টের না সুখের না উত্তেজনায় তা বুঝে উঠতে পারে না। শব্দ করে মুঠোর মধ্যে একটা বোমা ফেটে যাবার ভয়ে সে হাত শক্ত করে মুঠো করতেও পারে না। ঘরে আসবাবের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সোমনাথের মনে হয় ‘তার হাত থেকে কররেখা হারিয়ে গেছে’। অদ্ভুত সব ভাবনার মধ্যে দিয়ে সোমনাথের অস্তিত্বের সংকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আনন্দ আর লাভের মধ্যে সেজন্য ঠকে যাচ্ছে। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার সময় তার মনে হয়—

> “পথের দুপাশ, ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষ, শব্দ, হৈচৈ সব কেমন ভৌতিক লাগছিল। যেন প্রচণ্ড প্রয়োজনের নেশায় সবকিছুর আত্মা বিক্রী হয়ে গেছে। যেন সবাই আমরা চাবি দেওয়া পুতুল। যেন কেউ একটা প্রকাণ্ড বেলুন ফোলাচ্ছে আর তার গায়ে আমরা আঁকা, ছাপ দেওয়া। ভয়ে আমি চোখ বুঝে ছিলাম যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারি।”[১৬]

চশমা হারিয়ে যাওয়াকে চোখের খানিকটা দৃষ্টিশক্তি চুরি বলে মনে করে সোমনাথ। এমনকি শেষবারের মত ঘোড়ার রেস খেলতে যাওয়ার আগেই জেনেছিল তার মৃত্যু সংবাদও। আপাত উদ্ভট এক কাহিনির মধ্য দিয়ে সম্পর্কের বুনট ও সম্পর্কের ভাঙ্গন তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। অন্য দৃষ্টিতে ও অন্য আলোয় দেখা এক জীবনের নাটক এই‘ নীলরঙের ঘোড়া’। সে আলোর রং নীল যা কল্পনার রঙে— স্বপ্নের রং-এ মিশে

যায়। নীলরঙের ঘোড়া হল বর্ণময় কল্পনা যা ছন্দময় গতির ইঙ্গিতে ভরা। এই ঘোড়া হারিয়ে গেলে মানুষের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও ধূসর হয়ে যায়। একজন মানুষের যাপিত জীবন আর তার স্বপ্ন জীবন দুটোই বাস্তব এবং দুটোই সে বহন করে চলতে চায় একই সময়ে। তেমন কোনও জীবন নেই যে জীবন স্বপ্নহীন আর সে জীবন বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলে না। নাটকের সোমনাথের দুটো জীবন নিয়েই তার প্রকৃত জীবন। স্বপ্নের জগতের ছেলেটির দেওয়া রঙিন কাগজে লেখা বিজয়ী ঘোড়ার নাম এবং স্পেকুলেশন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক নয় বরং একটা স্বপ্ন বা একটা স্পেকুলেশন সেটাকে রূপ দেওয়ার প্রতীক। নাটকটি যে সময়ে লেখা হয় সে সময়ে কলকাতা শহরের জনপ্রিয় একটা জায়গা ছিল রেসের মাঠ। তখন যারা দেশের বই বিক্রি করত তারা বেশির ভাগই ১০-১২ থেকে ১৪ বছরের কিশোর। নাটককারের এই ভাবনার মধ্যে সেই কিশোরগুলির স্মৃতি মিশে থাকা অসম্ভব নয়। নাটকে প্রতিফলিত গার্হস্থ্য সম্পর্কের প্রেম প্রীতি ভালোবাসা এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েন দুটোই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তা সার্বিকভাবে সত্য। সোমনাথের স্ত্রী মৃন্ময়ী কেবল নিছক প্রেমময়ী স্ত্রী নয় বরং সে হিসেবি গৃহিণী। মৃন্ময়ী একজন মানুষ। আর মানুষ হিসেবে স্নেহ, প্রেম যেমন তার মধ্যে রয়েছে তেমনি অর্থের প্রতি লোভ, বড়লোক হওয়ার বাসনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ইচ্ছার পাশাপাশি সংসার জীবনে স্বচ্ছন্দের ইচ্ছাও বিদ্যমান। কারণ আমাদের অভ্যস্ত সংসার জীবনে স্বামী স্ত্রী পুত্র-কন্যা এদের নিয়ে চলার ক্ষমতা অভ্যাস তৈরী হয়ে যায়। একইসঙ্গে চলতে চলতে আলাদা দুটি সত্তা কখনো এক সঙ্গে মিশে যায় না। প্রত্যেকেরই ‘self identity’ ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। আবার এটাও দেখা যায় স্বামী স্ত্রী দুজন দুজনকে দখল করার প্রবণতা। মৃন্ময়ীর মধ্যে অভ্যাসগত দিকটা স্বাভাবিক এবং গ্রহণ করার প্রবণতাও তার মধ্যে প্রবল। বাস্তব আর পরাবাস্তবের মধ্যে নাটকের কাহিনি ঘোরাফেরা করেছে। সেই কারণে এই নাটকে নীল রঙের আধিক্য অনেক বেশি। কারণ আমরা জানি স্বপ্নের রঙ নীল। আকাশের শূন্যতা আর সাগরের প্রসারতার

রঙও নীল। অসীম, বিস্তৃত বা প্রসারিত অর্থাৎ যা কিছু মাপা যায় না তার ব্যঞ্জনায় নীল রঙের ব্যবহার হয়। পরাবাস্তব জগৎকে যেহেতু এই বস্তুজগতের মানদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না তাই নীল রঙের ব্যবহারের মধ্য দিয়েই তার ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন নাটককার।

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি। কাহিনি বিন্যাসের দিক থেকে তিন অঙ্কের এই নাটকটি একটি মফস্বল শহরের বড় পটভূমিতে লিখিত। নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে, বুলু নামক একটি মেয়ের সামনে বি.এ. পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও পাড়ার ছেলেদের আয়োজিত স্পোর্টসের উৎসাহ, উচ্ছ্বাস ও অনুরোধে-আবদারের তাদের স্পোর্টসের কার্ডে নাম লিখে দেয়। বাড়িতে সে একা। সুবোধ নামক বোকা ভীতু শান্তশিষ্ট যুবক তাকে ভালোবাসে। সব কিছুতে সুবোধের ভয়। বুলু তার এই ভয়টা ভাঙতে চায়। বুলুর বাড়ির সকলে বিয়ে উপলক্ষে মিরাট গেছে। সুবোধ বুলুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যাবেলায় একটা ছায়ামূর্তি দেখে ভয় পায়। হঠাৎ সে এসে বুলু ও ইতিমধ্যে আগত বুলুর বাবার বন্ধু ষাট বছর বয়স্ক নীরেন কাকুকে খবর দেয় যে, সে রেল লাইনের ধারে একটা মৃতদেহ দেখে এসেছে। তবে লোকটা জীবিত না মৃত তা সে ভালো করে দেখেনি। নীরেনকাকু কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। সে মনে করে তার বেঁচে থাকাটা একটা মিশনের জন্য। তার বড় একটা কাজ বাকি আছে। তবে কাজটা কি সে তা জানে না। ছায়ামূর্তির লোকটিকে সে খোঁজ করতে চায়। হঠাৎ এক আগন্তুক লোক এসে ওদের ঘরে ঢোকে। সুবোধ বুলুর কথায় উত্তেজিত হয়ে কার্তুজবিহীন বন্দুক নিয়ে যে লোকটিকে খুঁজতে বের হয়, সেই লোকটি সুবোধের কলার ধরে টেনে আনে। সুবোধ লোকটিকে খুনি ডাকাত বলার জন্য লোকটি হঠাৎ রেগে গিয়ে অদ্ভুত সংলাপ বলে। লোকটির হাবভাব অদ্ভুত। লোকটি কিছু করতে পারে না। গরমেও তার শীত করে। বুলুকে ঘিরে একটি প্রজাপতিকে উড়তে দেখে তার মনে হয় তার মাথা থেকে রঙিন প্রজাপতি বেরিয়ে গিয়ে ভীমরুল ঢুকে পড়েছে।

ভিমরুল]টি লোকটির মাথা- হৃৎপিণ্ডকে আঘাত করে। সে তার বাবাকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। মা বাবা তাকে খুব ভালোবাসত, তবুও একটা দুঃস্বপ্নের ঘরে সে তার বাবাকে হত্যা করে। পৃথিবীর উপর রাগ থেকেই সে এই কাজ করেছে। নীরেন কাকু লোকটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরের আখ্যা দেয়। বাকি অন্যান্য সকল চরিত্র তাকে সমর্থন করে। লোকটির সংলাপ তাই স্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয়ে অযৌক্তিক, অসংগত ও অদ্ভুত হয়ে ওঠে। সে নিজের নাম বলতে পারে না। যুব সম্প্রদায়ের কাছে 'জায়ান্ট ফিগার' হয়ে ওঠে। লোকটির প্রতি বুলুর আগ্রহ সুবোধের ঈর্ষার কারণ। এদিকে লোকটির বাবা খুঁজতে আসে। আসলে লোকটির বাবা মারা যায়নি। বাবাকে হত্যা করার ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন, একটা ধারণামাত্র। লোকটি বিশ্বাস করে সে বাবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হাতুড়ি মেরে হত্যা করেছে। লোকটি স্পোর্টসে অনেক পুরস্কার পায়, তাই তাকে নিয়ে ছেলেরা হইচই করে। লোকটির বাবা লোকটিকে স্কুল বানানোর, ব্রিজ বানানোর স্বপ্নের লোভ দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে বুলুর কথায় জানা যায়, তার ছেলে স্বাভাবিক জীবনের নিয়মে অভ্যস্ত নয়। লোকটি শূন্যতার অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম বীজ বানানোর স্বপ্ন দেখত। বাবার দেখানো লোভে বাড়ি ফিরতে চায় না সে। অনেক কথা কাটাকাটির পর লোকটি তার বাবাকে আবার খুন করতে যায়। বাবাকে হত্যার জন্য সে শুধু নিজেকে নয় সবাইকে, কমিউনিটিকে, গড়, ম্যান সবাইকে দায়ী করে। কিন্তু বাবা একবারও মারা যায়নি। শেষ পর্যন্ত লোকটি তার বাবার সঙ্গে চলে যায়। সবাই চলে গেলে বুলু একাকী হয়ে পড়ে।

তিন অঙ্কের এই নাটকে রয়েছে এক আগন্তুকের কাহিনি যে তার বাবাকে খুন করে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বুলবুলদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এই আগন্তুক লোকটির বাবা যে তার অস্তিত্বের মূলাধার আবার অস্তিত্ব সংকটের মূল কারণ। সে তার জন্মদাতাকে হত্যা করার পর নিজেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিবেক বলে উল্লেখ করে। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই চরিত্রটির মাধ্যমে আমাদের প্রচলিত কতগুলি

সংস্কারের মূলে আঘাত হেনেছেন। আসলে জন্মদাতাকে হত্যা করা আগন্তক লোকটির ধারণামাত্র। আগন্তুক লোকটি হল অস্থির সময়ের সচেতন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

'বাইরের দরজা' (১৯৬৫) মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তি মনের অনুভব প্রধান নাটক গুলোর মধ্যে অন্যতম। এই নাটকে তরুণী মঞ্জু নির্জন রাতে মুখোমুখি হয়েছে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার। তার মনের মধ্য থেকে উঠে এসেছে নিহত কামনা ও পুরানো স্মৃতি জড়িত অবচেতন সত্তা। নাটকে যা ঘটেছে তা সবই তার মনোজগতের ঘটনা। মঞ্জুর প্রাক্তন প্রেমিক অশোক আর বর্তমান প্রেমিক কমল এই নাটকে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে। তারই সঙ্গে এসেছে বিবেকসদৃশ পাহারাওয়ালা চরিত্রটি। নাটকের কাহিনির অগ্রগতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে অশোক বর্তমানে বেঁচে নেই। এক সময় অশোকের সঙ্গে কিশোরী বয়সে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল– হয়তো সেই তার প্রথম সম্পর্ক। তাই অশোক তার মনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মঞ্জু তাকে ভুলতে পারে না কোনোভাবে। এজন্যই মঞ্জুর মন তাকে তার বর্তমান প্রেমিক কমলার সামনে এনে হাজির করে। বোঝা যায় পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে মঞ্জুর মনের গভীর গহনে। বাস্তব মানুষ অনেক সময় ইচ্ছে মতো কোনো কিছু করে উঠতে পারে না। সমাজ, পরিবেশ, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি সততার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটি ছিল পুরোটাই সচেতন মনের পরিচায়ক। একে ভিত্তি করে নাটককার গড়ে তুলেছেন পাহারাওয়ালা চরিত্রটি। এ হল সেই মানুষ যে সবার লুকোনো বাসনাকে পাহারা দিয়ে বেড়ায় সর্বদা। যাকে আমরা ভয় পাই। নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই সব। গোপনীয়তার আড়াল সরবার আগেই। তাই অশোক, কমল, মঞ্জু তিনজনই বস্তুত মঞ্জুর মনই পাহারাওয়ালাকে মনে করেছে তার পরম শত্রু। তাকে সে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। কারণ মানুষের অবচেতন প্রায়শই সচেতন মনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সে কারণেই নাটকের শেষে কণ্ঠস্বর সংলাপে শোনা যায় –

"পাহারাওয়ালাটাকে মেরে ফেলা ভীষণ শক্ত। ওই দ্যাখো, ও উঠছে (পাহারাওয়ালা ধীরে ধীরে উঠে দরজার দিকে হেটে যেতে থাকে) ওর অনেক কাজ। দুটো প্রখর চোখ মেলে ওকে চিরকাল তাকিয়ে থাকতে হবে...।"[১৭]

এ কারণেই নাটকের শেষে মঞ্জু যে পাহারাওয়ালাটিকে বেরিয়ে যেতে দেখে বাইরের দরজা দিয়ে সে সমাজ নির্দিষ্ট সত্য বা আমাদের ন্যায়- অন্যায়ের এক অনুভব। একে মেরে ফেলা যায় না কখনো। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, অসম্ভবের প্রতীকায়িত ব্যবহার এবং সাংকেতিকতার সমন্বয়ে এই নাটকে নাটককার ফ্যান্টাসির সাহায্যে অপরূপ জীবনোপলব্ধির কথা বলেছেন।

'গন্ধরাজ হাততালি' (১৯৬৬) এই নাটকটিতে মানুষের ভালোবাসার সংকট রূপায়িত হয়েছে। মানুষ একই সঙ্গে একাধিক জনকে ভালবাসতে পারে। ভালোবাসা পেতেও পারে একাধিকজনের। মনের এই জটিল অবস্থানটি বিবৃত হয়েছে এই নাটকে। নায়িকা মীরা মানসিক দিক থেকে ঈষৎ অসুস্থ। তাকে ভালোবাসে প্রতিবেশী অরুণ, হঠাৎ এসে পড়া হরিকিঙ্কর এবং প্রণব মিত্র। প্রণব মিত্র অবশ্য মীরাকে কৈশোর থেকেই ভালোবাসে। প্রণব মিত্রের কাছে মীরার স্মৃতি রজনীগন্ধার সঙ্গে যুক্ত। প্রণব মিত্র চিঠিতে লিখেছে মীরার বয়স যখন চৌদ্দ-পনেরো। একদিন এক গাছা রজনীগন্ধার স্টিক হাতে নিয়ে মীরা ঘরে ঢুকেছিল। তার সাজপোশাকে ছিল জংলা রঙের শাড়ি, গোলাপি ব্লাউজ, দুধের মতো সাদা ফিতেয় বিনুনির শেষ প্রান্তে একটা ধবধবে ফুল। এভাবেই নাটকটিতে প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে যায় শুদ্ধতা রজনীগন্ধা ও গন্ধরাজ দুটি সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুল। অবশ্য এখানে ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে হরিকিংকর। কারণ তার প্রেম নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। সে নানা রঙের চশমা ব্যবহার করে ও মীরাকেও সেই চশমা উপহার দেয়। মীরা তার এই তিন প্রেমিককেই ভালোবাসে কিন্তু দেখা যায় শেষ পর্যন্ত অরুণই মীরার সঙ্গে থেকে যায়। প্রণব মিত্র ও হরিকিঙ্কর দুজনেই চলে গেলেও

মীরার প্রেম থেকে তারা বঞ্চিত হয় না। মীরা অনুভব করে একা বিচ্ছিন্ন মানুষ কখনোই সুখী হয় না। মানুষে মানুষে সংযোগে বেঁচে থাকার জন্য জরুরী আর প্রেমই সেই যোগ তৈরি করতে। ভালোবাসা অনেক সময়েই প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় না, তার কারণ সামাজিক পরিবেশ। গোপন প্রণয় মানুষকে অনেক সময় অসুস্থ ও বা অস্বাভাবিক করে তোলে। মীরার অসুস্থতার কারণ হয়ত অব্যক্ত বহুমুখী ভালবাসা। প্রেম যখনই ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ পায় তখনই যেন মানুষ হয়ে ওঠে স্বাভাবিক সহজ-সুস্থ। অবশ্য ত্রিকোণ প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বঘন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং কখনও কখনও তা অতিক্রম করে প্রেমই নিজস্ব দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। সেই প্রেমকেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রকৃত প্রেমরূপে তুলে ধরেছেন। যেখানে প্রেমের সম্পর্ক ঈর্ষায় পরিণত হয় না সেখানে প্রেম সহমর্মিতার সম্পর্কে উপনীত হয়। সিগ্ধ সুগন্ধ গন্ধরাজের মতোই তা বিকীর্ণ করে দেয় অসীম শক্তির অনুভব। এ নাটকে ব্যক্তিমনের ভালোবাসার সেই প্রশান্ত মহিমার সন্ধান মেলে। নাটকটি ব্যক্তির পরিচয় ও পরিচয় হীনতার সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আগন্তুক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকে। প্রণব আর হরকিঙ্কর এই দুটি আগন্তুক চরিত্র ছাড়া অরুণ এবং মীরা এই চারটি চরিত্রের আলাদা আলাদা সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি রিলেশন একটা আইডিয়া। মহাযুদ্ধের মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত রাষ্ট্র সমাজ ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর। যুদ্ধ সভ্যতাকে ধ্বংস করে, শান্তি ও প্রেম সভ্যতাকে গড়ে তোলে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা। গন্ধরাজের হাততালি হল এই ভালোবাসার দ্যোতনা।

'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' (১৯৬৬) : ভালোবাসার বন্ধন না থাকলে জীবন যে নেতিবাচক হয়ে পড়ে তারই এক দৃষ্টান্ত 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি। ভালোবাসার বন্ধন যাবতীয় প্রতিরোধকে দূর করতে সক্ষম। এই নাটকের নাটক ঘটনা ঘটেছে প্রাসাদ তুল্য এক পোড়ো বাড়িতে। ক্ষমতান্ধ রাজনৈতিক শক্তি প্রেমকে প্রতিহত করতে

চায়। নাটকে দেখা যায় এক সমাবেশে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, এক প্রৌঢ় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ, থানার ইন্সপেক্টর, স্কুল শিক্ষিকা শান্তা এবং বাড়ির মালিক মল্লিকবাবু তারা সকলে উপস্থিত হয়েছে— মৃত্যুর পর অশরীরী প্রেতাত্মা খুঁজতে। শান্তার হাতে সাদা ফুলের গুচ্ছ আলোর প্রতীকস্বরূপ— যা মৃত্যুকে পাহারা দেবে। শান্তা বিশ্বাস করে ভয়ংকর অলৌকিক ঘটনায়। মৃত প্রেতও ভালোবাসতে চায়। এই নাটকের নায়ক তার নেতিবাচক মনোভাব দূর করার জন্য চেয়েছিল এক নারীর ভালোবাসা। আলো-আঁধার, বিশ্বাস অবিশ্বাস সবকিছু মিলিয়ে আশ্চর্য ঘটনার ইঙ্গিত দেয় এই নাটক। চন্দ্রলোক হল সুস্থ জীবনের ইঙ্গিত। কল্পলোকের কর্তৃপক্ষ, শাসকের প্রতিনিধি বিপদজনক ঘোষণা করে একে। তারা চাঁদের আলোকে মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল। অলৌকিক বাতাসের খপ্পরে সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, বন্ধ হয়ে যায় বাঁচার সমস্ত পথ। প্রেতাত্মারও মৃত্যু হয় গুলিতে। জীবন প্রত্যয়ী এই নাটকে অগ্নিকাণ্ডের মত দুর্ঘটনায় চন্দ্রালোকও মানুষের জীবনে অভিশপ্ত হয়ে ওঠে।

অস্তিত্বের অর্থহীনতার নাটক ‘দ্বীপের রাজা’ (১৯৬৬)। এখানে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে এটা সেতুবন্ধন আবিষ্কারের চেষ্টা রয়েছে। ‘মৃত্যুসংবাদ’ নাটকে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের অর্থ ও অর্থহীনতার চিত্র। আর ‘দ্বীপের রাজা’ নাটকে তিনি দেখালেন শুধু আস্তিত্বের অর্থ ও অর্থহীনতা নয় আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা তাঁকে কী ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই নাটক ‘স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্নের নাটক’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। “ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া ‘থিয়েটার’ পত্রিকায় প্রকাশিত এ নাটকের মুখবন্ধে মোহিত জানিয়েছেন , “ বর্তমান নাটকটি ঘৃণ্য হাইড্রোজেন বোমার বীভৎস চরিত্রের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য রচিত।” বস্তুত স্পেনের পালামোরিস গ্রামে হোজে লোপেঞ্জ প্লোরিস নামে এক যুবক টম্যাটোর ক্ষেতে প্রায় তরমুজের মত আয়তনের একটি হাইড্রোজেন বোমায় লাথি মেরেছিল। এর ফলে তার সমস্ত শরীর

রেডিও অ্যাক্টিভাইজড হয়ে যায়। ঐ যুবক যাকে তার বন্ধুরা 'পেপে' বলে ডাকত সে এরপর স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। শুধু তাই নয় তার সংস্পর্শে যে আসবে তারই দেখা দেবে মৃত্যুর সম্ভাবনা। গোটা গ্রামটিই বোমার বিষের ভয়ে হয়ে ওঠে আতঙ্কিত। ... নাটকটির চরিত্র ও বর্ণ অনেকটা কোন স্বপ্নের দুঃস্বপ্নে বদলে যাওয়ার মতো, একটি সবুজ গাছের ক্রমশঃ ভৌতিক নিষ্পত্র শূন্যতায় রূপান্তরের মত – আজকের যুদ্ধের মুখোমুখি পৃথিবীর যা পরিণাম।"[স্যাস নাট্যপত্র, ১৬ সংখ্যা, ১৯৯৯; পৃষ্ঠা- ৩৪০] এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্বতন্ত্র এক কাল্পনিক কাহিনি সৃজন করলেন। নাটকের নতুন রূপের অন্বেষায় তিনি স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মধ্যবর্তী সেতুতে বাঁধলেন কাহিনিকে। স্বাভাবিকভাবে কিমিতিবাদের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তিন অঙ্কের এই নাটকের প্রস্তাবনায় আছে – 'একদল দ্বীপবাসী মেয়েপুরুষের আনন্দোচ্ছল অভিব্যক্তি। শক্তি আর সৌন্দর্য্যের প্রতিরূপ প্রায় নাচের ভঙ্গিতে দৃশ্যময় হবে। ওদের কণ্ঠনিঃসৃত গুঞ্জনে এই স্বপ্ন আর সাহসের উদাত্ত গভীর কম্পন। সমস্ত দ্বীপবাসীকে বিস্মিত করে এরোপ্লেনের গর্জন তীব্র হয়ে ওঠে। নাচের তাল কেটে যায় তাদের। একটা বিস্ফোরণ হয়। হতচকিত দ্বীপবাসী ভয়ে আর বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে। ধূম্রকুণ্ডলীর ছায়ায় মূর্তিগুলি আরও ছায়া হতে থাকে। আলোছায়ার মধ্যে চলমান নৃত্যময় মূর্তিগুলি প্রার্থনার মত ভঙ্গিতে স্থির হয়ে যায়।' [নাটক সমগ্র- মোহিত চট্টোপাধ্যায়] নাবিক, দ্বীপবাসীগণ, মোড়ল, চন্দন, ঝুমকো, গুণিন, চৌকিদার, দোলন, রঙন, সৈনিকগণ, সাগর, চিকিৎসক, পূজারী ও অন্যান্য চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে – এক নাবিকবুড়ো ডমরু বাজিয়ে হরেক ছবি দেখায়। দ্বীপবাসীগণ কাচের খোপে চোখ রেকেহ ছবি দেখে। সাতসাগরের হরেক ছবি দেখাবে বলে নাবিকবুড়ো হাঙর, কুমীর, তিমি হাঁ করে সাত রাজ্য গিলছে, বনমানুষ ফুল চিবোচ্ছে, আকাশে কালো শকুন ওড়ার ছবি, দানোর রথের ছবি, রথের পেট থেকে আগুনের গোলা নামছে আর মানুষ পোড়া ধোঁয়া উঠছে, গাছপালার ছাই উড়ছে,

পোড়ামাটির শ্মশান – এসব দেখায়। এই ছবি দেখে দ্বীপবাসীগণ ভয় পায়। তারা সমুদ্দুরের ছবি, নীলজল আর রঙিন রঙিন মাছ, সাদা রঙের শঙ্খ আর জলের নিচে লুকানো সবুজ ফুল পাতার ছবি দেখতে চায়। সেই নাবিকবুড়োর কাছে তারা ভিন দেশের সেপাই এর তাঁবুতে কি আছে জানতে চাইলে, নাবিক তদেরকে মোড়লের কাছে জানার জন্য যেতে বলে। সেপাইরা চন্দন নামের এক দ্বীপবাসীকে ধরে নিয়ে যায়। চন্দন সেখানে গিয়ে জানতে পারে সেপাইরা দ্বীপে হারিয়ে যাওয়া একটা গোলা খুঁজছে। সেপাইরা তাকে গোলার খবর জানতে চায় এবং খুঁজে দিতে পারলে পুরস্কার দেবার কথা জানায়। চন্দন ফিরে এলে দ্বীপবাসীরা তাকে সন্দেহ করে। মোড়ল চন্দনকে গুণিনের কাছে নিয়ে যায় তাকে অপদেবতা ভর করেছে বলে তার চিকিৎসার জন্য। অপরদিকে সাগর নামের এক যুবক প্রথম হারিয়ে যাওয়া গোলাটাকে অর্ধেক খোলা অবস্থায় দেখতে পায় একটা তরমুজের ক্ষেতে। গোলাটাকে কাটা মুণ্ডের মতো দেখায়। গোলাটা যেন রাক্ষসের মুখের মতো হা করে আছে সমস্ত মানুষকে গিলে খাওয়ার জন্য। তীব্র ঘৃণায় আধখোলা গোলাটায় লাথি মারে, তার উপর থুতু ফেলে। সে হয়ে ওঠে দ্বীপের রাজা যে প্রথম ওই গোলাটা দেখে লাথি মারার স্পর্ধা দেখিয়েছে। এই খবর সে তার স্ত্রী রঙনকে জানায়। রঙন সাগরের এই গোলায় লাথি মারার খবর জানায়। দ্বীপের সবাই সাগরকে রাজা হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু গোলায় লাথি মারার পর রাত্রি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। দ্বীপের সবাই সাগরের এই অবস্থায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পূজারী মন্দিরে যায় সাগরের কী হয়েছে তা দেবতার কাছে জানতে। মোড়ল চিকিৎসককে নিয়ে আসে সাগরকে পরীক্ষা করার জন্য। চিকিৎসক যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে জানায় গোলায় লাথি মারার কারণে সাগরের শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। সাগরের আর বাঁচার কোনো উপায় নেই। এই মারাত্মক বিষ দ্বীপের সকলের শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে তাই সবাইকে সাগরের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। রাজা হবার আনন্দে সাগর রঙনকে জড়িয়ে ধরার কারণে রঙনের

শরীরেও বিষ ছড়িয়ে পড়ে। সাগর আর রঙনের সন্তান দোলনকে মোড়ল পরীক্ষা করতে নিয়র যায়। চিকিৎসক জানায় দোলনের শরীরে বিষের পরিমাণ অনেক কম তাই চিকিৎসা করলে সে ভালো হয়ে যাবে। মোড়ল ঝুমকোর কাছে দোলন রাখার কথা জানায়। ক্রমে ক্রমে দ্বীপের সমস্ত আকাশ বাতাস মাটিতে বিষক্রিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চৌকিদার ও মোড়ল দ্বীপের সবাইকে বাঁআর জন্য দ্বীপান্তরে চলে যাওয়ার কথা বলে। সাগর মৃত্যু মুখে পতিত প্রেতের মতো হয়ে যায় সে চোখে দেখতে পায় না। রঙন তার সন্তান দোলনকে শেষ বারের মতো দেখতে না পেয়ে ভুল বকতে থাকে। দ্বীপের সবাই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেও চৌকিদার দ্বীপের রাজা ও রাণী সাগর আর রঙনকে দেখাশোনা করার জন্য দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারে না। এভাবেই নাটকের যবনিকা পতন ঘটে। এই নাটকের প্রধান চরিত্র সাগর এক প্রাণোচ্ছল যৌবনের প্রতীক রূপে প্রতিভাত। যান্ত্রিক সভ্যতার এক নিষ্ঠুর চিত্রকল্প ব্যঞ্জিত হয়েছে এই নাটকের মাধ্যমে।

১৯৭০-৭১ সালের ঝড়ের হাওয়ার পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর সাজানো-গোছানো সংসারের চিত্র বর্ণিত 'বাঘবন্দী' (১৯৬৯) নাটকে। বাস্তব আর অবাস্তব আলোছায়ায় সম্পর্কের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন নাটককার।

'রাজরক্ত' (১৯৭১) নাটকে রাজনৈতিক মাত্রা লক্ষ করা যায়। নাটকে ঘটে যাওয়া ঘটনা গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে দ্যোতিত করে। সমবেত জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় রাজাসাহেবের পরাজয় নিশ্চিত করার ইঙ্গিত রয়েছে এই নাটকে।

'সোনার চাবি' (১৯৬৬) নাটকের নায়ক গৌতম একটি সোনার চাবি পায়। তারপর থেকে সে খুঁজে যায় একটি বাক্স। যে বাক্স খোলা যাবে সোনার চাবি দিয়ে। আশ্চর্য সেই বাক্স যার মধ্যে আছে অকল্পনীয় দুর্লভ রত্ন সম্ভার। হঠাৎ এসে যায় সৌমেন্দু নামক চরিত্রটি। গৌতমের প্রেমিকা নন্দিতার সহায়তা এবং কিছুটা সম্মোহনের দ্বারা বাক্সটা খুঁজতে চেষ্টা করে সে। যদিও গৌতম এতদিন নন্দিতার প্রেমকে গ্রাহ্য

করেনি। কিন্তু বাক্সটা পাওয়ার সম্ভাবনায় তার মনের মধ্যে বেজে ওঠে ভালোবাসার সুর। শেষ পর্যন্ত সেই সোনার চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দেখা যায় আরেকটি চাবি। হয়তো মানুষের পরম কাম্যকে না পাওয়ার ইঙ্গিত নাটককার আমাদের দিয়েছেন নাটকের মাধ্যমে। পরম কাম্যকে কোনদিনও পাওয়া যায় না, তাকে কেবল খুঁজে যেতে হয়। সন্ধানের এই প্রয়াসই গৌতমকে উপলব্ধি করতে শেখায় যে বাক্সের ভেতর রাখা কোন জড় সামগ্রী নয় মানুষের আসল প্রয়োজন সেই বাক্স যার মধ্যে রয়েছে সহানুভূতি মমতা ও ভালোবাসা। ভালোবাসার মধ্যেই পাওয়া যায় পরম প্রাপ্তিকে। এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গৌতমের শেষ সংলাপ –

> "নন্দিতা, মনে হচ্ছে তোমার মুখের মধ্যে সেই কাজ করা মণিমুক্তোর বাক্সটা, আমি ওটাকে খুঁজে পাইনি এতকাল... নন্দিতা তোমার মধ্যে এত মুক্তো, এত হিরো...! সব ওই বাক্সটায় সাজিয়ে রেখেছে। আমি এই হীরের আলোতে মুখ ডুবিয়ে রাখব;..."[১৮]

প্রেমের অনুসন্ধান ও প্রার্থিত প্রাপ্তি খুঁজে পাওয়া ব্যক্তি মনের চিরদিনের অনুভূতি। এখানেই নাটকের নান্দনিক মূল্য উপলব্ধ হয়।

"কবিরা নাটক লিখলে নাটকে একটা নতুন মাত্রা আসে, নাটকের মধ্যে একটা ভিন্নতা আসে। একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। পৃথিবীর নাটকের ইতিহাস পড়লেই এগুলো বোঝা যায়, জানা যায়।"[১৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ষাটের দশকের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে এ কথা বলা চলে। সাহিত্যাকাশে তাঁর প্রথম আবির্ভাব কবি হিসাবে। এক সময় তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ প্রমূখ কবি সাহিত্যিকদের মত কৃত্তিবাস পত্রিকার খ্যাতিমান প্রথম শ্রেণির কবি ছিলেন তিনি। যদি আজীবন কাব্য চর্চা করতেন তাহলে হয়তো কাব্যজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আর পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ কবিদের আসনে বিরাজ করতেন। কাব্য জগত থেকে সরে

যাওয়ায় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একসময় হতাশার সুর শোনা গিয়েছিল। কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায় কাব্য থেকে নাটকের জগতে সরে আসার জন্য যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন তা– *"কবিতার মধ্যে আমি আমাকে খুজতে চাইছিলাম যেন তা পাচ্ছিলাম না একে আমি মনে করতাম শবকাম, মৃতের উপর বসে সাধনার চেষ্টা।"*[২০] এছাড়া তিনি তাঁর 'কেন লিখি' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "কিন্তু কেবলমাত্র Creative Freedom-এর উল্লাস, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির আবিষ্কার বা শিল্পের কারুকার্য হওয়ার জন্যই তো লিখতে চাই না। কেন লিখি তার প্রধান কারণ মানুষ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। এমন একটা পরিবেশের মধ্যে আমরা রয়েছি যেখানে বেশিরভাগ মানুষ কোন ক্রমেই সুখী নয়, অভাব অসন্তোষে তারা কণ্টকিত, তাদের জীবন নিষ্প্রভ, স্বপ্ন বর্ণহীন, আশা দুরাশা মাত্র। মানুষ যদি আন্দোলিত হয়ে না ওঠে এই বিধ্বস্ত জীবন সতেজ, সজীব এবং সুন্দর হয়ে উঠবে কেমন করে ? অথচ গোটা পৃথিবীটাই কেমন আন্দোলনহীন। সঠিক রাজনীতির হাতেই রয়েছে এইসব ভাবনার মধ্যে নতুন নির্মাণের শক্তি। কিন্তু কেবল রাজনীতি নয়, শিল্প - সংস্কৃতির ভূমিকাও এক্ষেত্রে কম নয়। একজন লেখককেও তাই সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন থেকে মানুষের জীবন ও পরিবেশ বদলে দেওয়ার, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষকে প্রসন্নতা দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। একজন আদর্শ লেখক চিরকালই মানুষ ও সমাজের বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনীতি এই বিবেক বোধ উপলব্ধির, তাই মানুষকে মানুষের কল্যাণকে উপেক্ষা করে যে লেখা তা বিবেকহীন বিভ্রান্তি। আমি বুঝি আমি এমন ক্ষমতাবান লেখক নই যে, আমার লেখার মধ্য দিয়ে মানুষের দুরাবস্থা বদলে দিতে

পারব। তাই বলে কর্তব্যই বা ভুলি কি করে ? করে তাই সীমিত ক্ষমতা নিয়ে লিখতে চাই মানুষের হয়ে মানুষের জন্য।” [২১]

এমনই এক দায়িত্ববোধ নিয়েই তিনি নাটকের জগতে এসেছেন তাঁর এই অঙ্গীকার মানবদরদী অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সামাজিকতা ও মানবিকতার গভীর আত্মানুভূতি অনুপ্রেরণায় তিনি রচনা করেছেন শতাধিক ছোট-বড় নাটক। তাঁর ‘মাছি’ নাটকটি ১৯৭৮ সালে লিখিত থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকায় প্রকাশিত, বেতার ও মঞ্চে প্রযোজিত এই একাঙ্ক নাটকটি পশ্চিমবঙ্গের বন্যা কবলিত গ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত। একথা অজানা নয় যে ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যা সম্পর্কে বাঙালি মাত্রই অবগত। মানুষের চরম দুর্দশার চিত্র মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ভিত কেঁপে গিয়েছিল। কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে জেগে উঠেছিল দায়িত্ববোধ। এরকম দুর্ভিক্ষ পীড়িত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সাহিত্যের পরিচয় ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘মাছি’ নামক একাঙ্ক নাটকের কাহিনিতে এই বন্যা কবলিত গ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন। কাহিনির বিস্তার বড় চেনা জানা- তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্রের মতো নাট্যকারদের অনুসারী। বিধ্বংস বন্যা কবলিত বাস্তব চিত্র অঙ্কিত এই নাটকের কাহিনিতে রয়েছে– গ্রামের মাতব্বর বৈকুণ্ঠ চৌধুরী বাড়ি। জানালা সংলগ্ন টেবিলে বসে বৈকুণ্ঠের ভাইপো কালাচাঁদ ছিপে মাছ ধরে। রেডিও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দাপটে দেশের জনজীবন ও অর্থনীতির বিপর্যয়ের খবর এবং বন্যার নানা খবর পরিবেশিত হয়। এই খবরে কালাচাঁদ ক্ষুব্দ হয়ে রেডিও বন্ধ করে দেয়। তার ছিপে একটা বড় কিছু গেঁথেছে। তাই বৈকুণ্ঠ ও কালাচাঁদ দুজনে মিলে টেনে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা দুজনে ব্যর্থ হয়। ছিপ কেটে শিকার পালিয়ে যায়। ছিপে গাঁথা শিকার সম্পর্কে কালাচাঁদের মনে হয় চারমণ ওজনের মাছ, যার নাকে সোনার নোলক। বৈকুণ্ঠের মনে

হয় মরা পচা গরু-ছাগল। ছিপে গাঁথা শিকার তুলতে গিয়ে বৈকুন্ঠের মনে হয় জেঠা ভাইপো দুজনকে টেনে নিলে চৌধুরী বংশের বাতি দেবার আর কেউ থাকবে না। বৈকুণ্ঠও মাছ ধরার জন্য সাধ করে টোপ হিসেবে পিঁপড়ের ডিম এনেছে। কিন্তু বাকি ছিপটা ভেঙে দেয় কালাচাঁদের বউ। তার বাপের বাড়ির খবর না পাওয়ায় সে সারাদিন মুখে কিছু দেয়নি। বউয়ের ঝগড়া করে কালাচাঁদ বেরিয়ে পড়তে চায় সন্নাসীর মতো। বৈকুন্ঠের বাড়ির চাকর পালান বউ বাচ্চার খবর নেওয়ার জন্য বাড়ি যেতে চায়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ তাকে যেতে দেয় না। এদিকে গ্রামের মানুষের ঘর বাড়ি সব বন্যার জলে ডুবে যাওয়া বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেয়। তবে সকলের ঠাঁই হয় না। গ্রামের বাচ্চা ও বুড়ো মানুষ গুলো খেতে না পেয়ে এবং দূষিত জল খেয়ে মারা যায়। গ্রামে মড়ক লাগে। গ্রামের কিছু মানুষ বৈকুন্ঠের তিনতলা বাড়ির দোতলার বারান্দায় আশ্রয় নেয়। কালাচাঁদ তাদের মুড়ি খেতে দেয়। গগন ও তার স্ত্রী পাখি তাদের ছেলের কোনো খোঁজ পায় না। খুঁজতে খুঁজতে তারা বৈকুন্ঠের বাড়িতে এসে উঠে। গগনের বউ পাখিকে দেখে বৈকুন্ঠের বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থে লোক দেখানো মায়া উথলে ওঠে। পাখিকে এক মুঠো ভাত খাওয়াতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। গগন ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা বৈকুন্ঠের মতলব বুঝে ফেলে তারা সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং বাড়ির ভেতর থেকে পাখির চিৎকার শুনে তারা পাখিকে বৈকুন্ঠের কবল থেকে রক্ষা করে। অপরদিকে গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের ধানের গোলা লুট হয়ে যাচ্ছে তার জন্য খবর থানার দারোগা বৈকুণ্ঠবাবুকে সাবধান থাকার আগাম খবর জানিয়ে যায়। বাড়ির চাকর পালান জানিয়ে দেয় বাড়িতে লেপ, বালিশ, তোশকের ভিতরে লুকিয়ে রাখা চালের কথা, ঠাকুর ঘরে পাহাড় করে রাখা চালের খবর। গ্রামবাসীরা লুটপাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু স্বয়ং দারোগা বৈকুন্ঠের বাড়িতে থাকায় তারা সুযোগের অপেক্ষা করে। অপরদিকে আগের দিন থেকে পালানের ভেদবমি শুরু হয়। একটি মাছি পালনের ভেদবমি থেকে কলেরার বিষ

ছড়িয়ে দেয় বৈকুণ্ঠের খাবারের মধ্যে। বৈকুণ্ঠ মারা যায়। অসহায় মানুষগুলোর অপারগ কাজকে একটা ‘মাছি’ সম্পন্ন করে, এখানেই কাহিনির সমাপ্তি।

সমাজের প্রতি এবং অসহায় মানুষের প্রতি শিল্পীসুলভ এক দায়িত্ববোধ থেকে ‘মাছি’ নামক একাঙ্কের সৃষ্টি। নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণে নাটককারের জীবনদর্শনের স্বরূপ উপলব্ধ হয়। নাটককার একটি বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রতিবন্ধকতার অনিঃশেষ বাতাবরণে মানুষ কত অসহায়। মানুষের মিলিত প্রচেষ্টাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং আইন-আদালত, প্রশাসনযন্ত্রের কাছে নিরুপায় এরকমই এক চিত্র ‘মাছি’ নাটকে সন্নিবিষ্ট। মিতায়তন এই নাটকের সূচনায় রয়েছে বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর ঘর, তার পিছন দিকের দেওয়ালে পূর্বপুরুষদের চিত্রের দুপাশে গণেশ জননী এবং শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের ফটো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবহাওয়ায় কালাচাঁদ (বয়স ত্রিশ বছর) গলায় কম্পটার লাগিয়ে জানালার ধারে টেবিলে বসে ছিপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ আছে এবং ট্রানজিস্টারে তারস্বরে খবর ‘অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগের দাপটে দেশের জনজীবন ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত। ... উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে প্রতিবন্ধকতা।’ কালাচাঁদ রেডিওটা বন্ধ করে দেয় ক্ষুব্ধভাবে। কালাচাঁদ গ্রামের মাতব্বর, বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর ভাইপো। চৌধুরী বংশের ভবিষ্যৎ। সূচনাংশের দেওয়ালের চিত্রগুলো নাটকের মূল বিষয় সম্পর্কে একটা পূর্বাভাস দেয়। গণেশজননী মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী পৃথিবীকে অসুরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের চিত্রে পুরুষদের আদিরসাত্মক লাম্পট্যের দ্যোতনা পরিস্ফুট। এখানে নাটকে চিত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে লোভ-লালসা তার বিনাশের ইঙ্গিত তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। নাটকে দেখা যায় বৈকুণ্ঠ গগনের স্ত্রী সন্তান হারানোর শোকে কাতর পাখিকে নিয়ে তার অদম্য কামনার আগুন চরিতার্থ করতে চায়। আর একই কারণে গগন ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা বৈকুণ্ঠের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় মত্ত হয়ে ওঠে। যদিও তা সাধিত হয় এক ভিন্ন উপায়ে। সমাজে বৈকুণ্ঠের মত চরিত্রগুলোর মজ্জাগত যে, নারী ভোগের বস্তু। অভুক্ত মৃতপ্রায় কিংবা

সন্তানহারা সমস্ত যেই হোক না কেন। আর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্বাস্ত সমস্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংকটে ধনী মালিক জোতদার শ্রেণির নারী লোলুপতা, নারী ধর্ষণের দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কথাসাহিত্যিকদের গল্প-উপন্যাস প্রভৃতির মতো নাটকে বিশেষ করে 'নীলদর্পণ' থেকে শুরু করে 'দেবীগর্জন' পেরিয়ে একুশ শতকের বাংলা নাটকের পরিচিত ঘটনা। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের রোগ সাহেবের হাতে ধর্ষিত ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করেছিল নবীনমাধব ও তোরাপ। ধর্ষকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল চাষা তোরাপ। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকের প্রভঞ্জন রত্নাকে কাজের লোভ দেখিয়ে কামনাবহ্নি চরিতার্থ করে। রত্নাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় সতীত্ব রক্ষার্থে। রত্নার স্বামী মংলা সেখানে প্রভঞ্জনরূপী অসুরকে হত্যা করতে খড়্গ উচিয়ে ধরে। এই নাটকে দেখা যায় বৈকুণ্ঠ রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বেলে পাখিকে ঘরের ভিতর নিয়ে যায় ভাত খাওয়া বলে। খানিক পরে লণ্ঠন নিভে যায় ও পাখি চিৎকার করে ওঠে। গগন ও অন্যান্য সকলে ছুটে যায়। পাখিকে রক্ষা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় লোকগুলোর মুখে শুধু 'সমুন্দির পোর ধরতি পারলে নলিডা ছিঁড়ে নেতাম', 'কিংবা 'সমুন্দির পো য্যাদ্দিন বাঁচবে খালি মাইরবে, ও শালারে আজ জলে চুবিয়ে মাইরব' –এ জাতীয় বুলি আওড়ায়। কিন্তু এ কেবলই তাদের উষ্মা প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যক্ষভাবে তারা প্রতিশোধ নিতে পারে না। অসহায় দুর্গত মানুষদেরই একজন বুড়ো বলে,- 'আজ থানার দারগা, কাল বাবুর বন্দুক, পরশু ভবিষ্যতের চিন্তা। গগন, নলিডা ধরবার দিনক্ষণ যে আর দেখচি না রে।'

ভিন্ন দেশকালের প্রেক্ষাপটে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা প্রায় একইরকম হলেও প্রতিবাদের পথ ভিন্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুঃশাসনীয়' গল্প বস্ত্র সংকটের সময় আনোয়ারের মতো দরিদ্র মানুষেরা কাপড় যোগাতে পারে না। তাই কাপড় দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলো ইট-পাথর ভরে মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে

পুকুরের জলের নিচে পাঁকে গিয়ে শুয়ে থাকে। আবার 'উপায়' গল্পের মল্লিকা এ জগত থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে প্রতিরোধের উপায় খোঁজে অন্যভাবে। তাই সে বলে- 'এইবার ছোরা নিয়া যামু লুকাইয়া। বুঝছস ঠাকুরঝি একখান ছোরা নিয়া যামু'। আবার ভিন্ন এক প্রতিবাদের চিত্র দেখা যায় মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙা মধু' (১৯৬৯) নাটকে। যেখানে মহাজন অঘোর ঘোষের সাপে কাটা দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে গিয়ে জটা এবং মাতলা নানা কৌশল অবলম্বন করে যাতে অঘোর ঘোষের মতো অত্যাচারী মহাজন আর বেঁচে উঠতে না পারে। অঘোর ঘোষের দেহ থেকে বিষ ঝাড়াতে গিয়ে সমস্ত অত্যাচারের কথা মনে হয় তাদের, জটা ও মাতলা সুস্থ-সবল মহাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অক্ষম। তাই তারা অঘোর ঘোষের সাপে কাটা দেহকে বেছে নেয় প্রতিবাদ জানাতে। যদিও নাটকে অঘোর ঘোষের নিধন ঘটে বাদামীর হাতের কচ্ছপ ধরার সড়কির কোপে। এই আপাত পরিচিত প্রতিবাদের ধারায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য ব্যতিক্রমী সংযোজন। তার নাটকে 'যদি', 'স্বপ্ন'র প্রাধান্য। কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান অসম্ভব নয় বরং অক্ষম, অসহায় মানুষের কল্পনায় মিশে থাকা- মনের অতল গহ্বরে অচেতন লোকে জমে থাকা জটিল অথচ নানান রহস্যময় ইচ্ছাপূরণের স্বতন্ত্র ভাবনার যোগ স্পষ্ট। তাঁর 'মাছি' নাটকে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের প্রতিবাদের চরম ভাব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ভাষার উষ্মায় প্রকাশিত। তাদের মিলিত সংগ্রামের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তারা অবতীর্ণ নয়। যেমন 'রাজরক্ত' নাটকে ছেলেটা বারবার রাজা সাহেবের বিরুদ্ধে শাণিত অস্ত্র তুলে ধরেছে কিন্তু আঘাত হানতে পারেনি। সেখানে রাজাসাহেবের শাস্তি অদূর ভবিষ্যতে সাধিত হবে এরকম আশার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাটককার। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনেক নাটকেই 'যদি এমনটা হত' এমন ভাবনা বা 'ম্যাজিক ইফ'-এর কথা বলেছেন। যেমন তাঁর 'মুষ্ঠিযোগ' নাটকে যদুপতি এক দুর্বল ব্যক্তি যে সকলের কাছে অপমানিত, অপদস্থ, অত্যাচারিত। কোনো এক অলৌকিক শক্তিতে সে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং সবাইকে উপযুক্ত সাজা

দেয়। 'মাছি' নাটকের সমাপ্তি সেরকমই ইঙ্গিত বহন করে। এক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্কে অলৌকিকতা নয় বরং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। বৈকুণ্ঠের পাহাড় প্রমাণ পাপের শাস্তির কারণে তার মৃত্যু ঘটেনি। মাছি একটি রোগ জীবাণু বহনকারী পতঙ্গ। কোনো সময়ই মাছির সংস্পর্শ স্বাস্থ্যকর নয়। 'মাছি' নাটকে মাছির দ্বারা কলেরার জীবাণু বহনের মাধ্যমে অত্যাচারী বৈকুণ্ঠের মৃত্যু স্বাভাবিক ওঠে। কিন্তু নাটকে প্রতিফলিত অলৌকিকতার দিকটি কোনো ভাবেই উপেক্ষিত নয়। মাছি এখানে নির্যাতিত অসহায় মানুষগুলোর প্রতিশোধ স্পৃহার ইচ্ছাশক্তির রূপান্তরিত প্রতীক হয়ে উঠেছে। নাটকের প্রথম থেকেই নাটককার ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। গল্পের সূচনা থেকে এসেছে মাছের প্রসঙ্গ। মাছ আর মাছি ধ্বনিগত সাম্য লক্ষণীয়। প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও এই জলজ প্রাণী দুটি এক হয়ে উঠেছে। সৌখিন বিলাসী মানুষের কাছে মাছ শিকার স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু নাটকে মাছ শিকারের বস্তুতে রূপান্তরিত হয়নি সেই বরং কালাচাঁদ ও বৈকুণ্ঠ দুই অসম শক্তিকে পরাজিত করে তাদের উপকরণ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আবার জনরোষের নাগাল থেকে দারোগা দ্বারা সুরক্ষিত বৈকুণ্ঠকে একটি ক্ষুদ্র মাছি হত্যা করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ অত্যাচারিত অসহায় গ্রামবাসীর সম্মিলিত সংগ্রামের ইচ্ছাশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে মাছি।

নিপীড়িত মানুষের দরদী নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মরমী ভাবনায় তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত মানুষের জীবনচিত্র নাটককারে গভীর জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। বন্যাকবলিত গ্রামের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অসহায় চিত্রকে জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য চিত্রকল্পের বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন। যেখানে অসংখ্য মানুষ বিপন্ন, জলমগ্ন অঞ্চল গুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত সেখানে গ্রামের মাতব্বর বৈকুণ্ঠ চৌধুরী ও তার কার্যকলাপ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে স্পষ্ট করে।গ্রেমের আশ্রয়হীন অসহায় নিরন্ন মানুষের কথা- দুবেলা সরু চালের ভাত, সরবাটা ঘি খাওয়া আর্থিক সঙ্গতি

সম্পন্ন মানুষেরা ভাবে না। যেখানে বন্যার স্রোতে নির্বিশেষে মানুষ ও পশুর দেহ ভেসে যাচ্ছে, সেখানে বারান্দার টেবিলে বসে মাছ ধরতে ব্যস্ত। কৃষকদের জমির চাষের ধান উঠেছে বৈকুণ্ঠের গোলায়। গ্রামবাসীরা এসকল অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করলেও অভুক্ত অবস্থায় তারা খেপে ওঠে। বাঁচার জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থানার দারোগা। ফলে তাদের মিলিত সংগ্রামের প্রয়াস স্তিমিত হয়ে পড়ে। নাটককার তাদের অসহায়তাকে যে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে নাটকের মধ্যে। যে কাজ গ্রামের পাঁচজন মিলে করতে পারেনি একটা মাছি সেই কাজ করে দেয়। কাহিনিকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য তিনি একেবারে গ্রাম্য ভাষায় এনে বসিয়েছেন চরিত্রগুলোর মুখে। ফলে চরিত্রগুলোও হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত এবং নাটকটি শৈল্পিক মর্যাদা লাভ করেছে।

মানসিক অবসাদ কাটিয়ে মনুষ্যত্ত্বের জয়গানের নাটক 'লাঠি'। হরিপ্রসাদ, রতন, সুখেন, ঘোষ, অন্নদা ও নীলু এই ছটি চরিত্রের মধ্যে কাহিনি আবর্তিত। হরিপ্রসাদ নিতান্তই সাধারণ এক কর্মচারি। একদিন অফিস থেকে বেরোবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বন্ধুর কাছে অফিসের মালিক ঘোষ সম্পর্কে ছোট মুখে বড়ো কথা বলে ফেলে। সে অফিসের মালিক ঘোষের বাপকে চাষা আর ঘোষকে জানোয়ার বলে। পেছন থেকে স্বয়ং মালিক এই কথা শুনে ফেলা থেকেই হরিপ্রসাদ উদাসীন হয়ে থাকে। কারোর সঙ্গে কোনো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। সে অফিস কামাই করে। তার ছেলে রতন তার বাবার অফিসে না যাওয়ার প্রকৃত কারণ জানতে পারে। খবর জানার পর থেকে বাড়ির সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সকলের অনুরোধে এবং মালিকের সমন ধরানোর কারণে হরিপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত মালিকের বাড়িতে ক্ষমা চাইতে যায়। বসবার ঘরে মদ খাওয়ার সময় মালিক ঘোষ ও তার বন্ধু সুখেন অপমান করার খেলায় মেতে ওঠে। চেয়ারে উঠে কান ধরে থাকায় তবেই অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পায়। চরম অপমানে ভেঙে পড়ে হরিপ্রসাদ। এই চরম অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রুখে দাঁড়াতে বাড়ির সকলে

বলে। এতে হরিপ্রসাদ নিজের ভিতরে বাঘের মত শক্তি অনুভব করে। পরদিন সকালে সে মালিকের বাড়ি গিয়ে নিজের পায়ে জোর পাওয়া লাঠি দিয়ে জানোয়াররূপী মালিককে উচিৎ শিক্ষা দেয়। পায়ে ভর করে দাঁড়ানো লাঠিকেই সে প্রতিবাদের হাতিয়ার করে তোলে। এই লাঠির জোরেই সে ভয়কে জয় করে। হরিপ্রসাদের মধ্যে ভয়কে জয় করার জন্য হঠাৎ করে তার মধ্যে কোনো এক জাদু যেন কাজ করে। হরিপ্রসাদ চরিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই নাটকে। স্ত্রী অন্নদা চরিত্রটিও চমৎকার ভাবে অঙ্কিত।

'ঢিসুম ঢিসুম' (১৯৯২): সংস্তব গোষ্ঠীর নাট্য প্রযোজনা 'মুষ্ঠিযোগ'। মধ্যবিত্ত শ্রেণি অকারণ ভয় কাতর শক্তির বিকাশের দিকে মন দেয় না। ফলে জাগতিক দিক থেকে অন্তহীন হয়ে ওঠে তার দুর্দশা। এই নাটকটিতে নাটককার দেখিয়েছেন মানুষের জীবনে সফলতার একমাত্র পথ হচ্ছে নিজের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। 'ঢিসুম ঢিসুম' নাটকের নায়ক যদুপতি মধ্যবিত্ত মানুষ। তার স্বভাব দুর্বল। বাস্তবে সে তার বিরোধীদের আক্রমণ করতে পারত না তাই ঘুমের মধ্যে সেই কাজটি সেরে নেয়। হঠাৎ এসে যায় এক ফকির, তার দেওয়া বড়ি খেয়ে যদুপতি নিজের মধ্যে অনুভব করে এক অলৌকিক শক্তি। আর তাকে সাহস যোগায় বাল্যবন্ধু নিতাইয়ের অশরীরী কণ্ঠস্বর। পরিণামে দেখা যায় তার কাছে পরাস্ত হচ্ছে দুর্ধর্ষ গুণ্ডা ভাট্টা আর জগা মিত্তির। বস্তুত প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে নিহিত শক্তি। মানুষ সেই শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। অথচ সেই শক্তি একদিন জাগ্রত হবেই। প্রত্যেকটা মানুষ এমনকি যদুপতির মত অপদার্থ একজন মানুষও পৃথিবীতে আসে একটা মিরাক্কেল ঘটাতে। একটা মুহূর্ত জীবনে আসবেই তখন তুচ্ছ একটা সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যদুপতির অন্যত্র বদলি বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার দজ্জাল স্ত্রীও বশ মেনেছে। এভাবেই নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় মানুষের নিজস্ব শক্তির সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। হয়তো নাটককার সমকালের বাঙালি চরিত্রে ভয়ের আধিক্য দেখে

ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজ ও সক্রিয় মাধ্যম নাটকের মধ্য দিয়ে এই জাতিগত দুর্বলতার বিলুপ্তি ঘটাতে চেয়েছেন।

'দর্পণ' (১৯৯৯): মানুষের মনে মানবিকতা ও সমাজ পরিস্থিতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বদাই চলে তারই একটি রূপরেখা দেখা যায় 'দর্পণ' নাটকটিতে। অনেক সময় মানুষ যথার্থ মানবিক কর্তব্য করে উঠতে পারে না সমাজবিধির কথা মনে করে। মধ্যবিত্ত মানুষের সেই চরিত্রগত ত্রুটি অনেক সময়ই তাকে যথার্থ করণীয় থেকে বিচ্যুত করে। 'দর্পণে' নাটকে এই ত্রুটি এবং তজ্জনিত সংকটের দিকটি রূপায়িত হয়েছে। নাটকের ঘটনাবস্তুতে রয়েছে - অবিবাহিত দুই বন্ধু দুলাল ও নরেন ভাড়া বাড়িতে থাকে। সে বাড়িতে এক রাতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় সুন্দরী যুবতী স্বর্ণ নামের এক মহিলা। ঘটনাক্রমে জানা যায় পিছু নেওয়া এক দুর্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচতে এ বাড়িতে এসে ঢুকেছে সে। সে আর বাঁচতে চায় না শুনেও দুলাল তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। কারণ হিসেবে সে বলে—তার বন্ধু নরেন নাইট ডিউটি থেকে এখুনি এসে পড়বে আর বাড়ির মালিক নিবারণ কাকু ওপর থেকে নেমে আসবেন তাতে তার বিপদ বেড়ে যাবে। শেষ রক্ষার আর কোন উপায় থাকবে না। যদিও সেবারের মত স্বর্ণ বাড়ি থেকে চলে যায় কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নরেন অসুস্থ স্বর্ণকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে। তাদের ঘরে আশ্রয় দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চায়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দুলাল ও তার কষ্টের সঞ্চিত অর্থ নরেনের হাতে স্বর্ণের চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়ে দেশে চলে যায়। এর নাটক থেকে বোঝা যায় স্বভাবত মানুষ বিপন্ন মানুষকে সহায়তা করতে আগ্রহী। কিন্তু অনেক সময় একক মানুষ পরিস্থিতির চাপে বিশেষত 'লোকে কি বলবে' এই ভাবনা থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। কিন্তু যখনই অন্য মানুষ তার পাশে এসে দাঁড়ায় তখন তার মনের স্বাভাবিক মানবিকতা মুক্তির পথ খুঁজে পায়। মানুষের মধ্যে যে মানবিকতার অনুসন্ধানে নিরত মোহিত চট্টোপাধ্যায় সে পরিচয় রয়েছে এ নাটকটিতে। একক মানুষ নিয়ত বিপন্ন। যখনই তার পাশে এসে দাঁড়ায় সহমর্মী কোন বন্ধু তখনই

সে খুঁজে পায় বিপন্নতা থেকে মুক্তির পথ। মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'দর্পণ' নাটকটিতে এই সত্যকেই উপস্থাপিত করেছেন।

'ঘুম' (২০০৩): মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যথার্থ মানুষের সন্ধানের একটা প্রয়াস ছিল। তিনি চেয়েছিলেন অস্তিত্বের যে স্বাভাবিক দুর্বলতা মানুষকে সংকটাপন্ন করে তা দূর করে মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠুক। তিনি সেই মানুষকে খুঁজতেন যে সামাজিক ভাবে দুর্বল হলেও মনের দিক থেকে শক্তিমান। 'ঘুম' নাটকটি তাঁর সেই সন্ধানেরই ফসল। চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের সমাজে অনেক সময়ই কর্মক্ষেত্র এবং কর্তব্য এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। 'ঘুম' নাটকের সেই দ্বন্দ্বজনিত সংকট এবং তার পরিণাম চিত্রিত হয়েছে। মিস্টার মিত্র চাকরি সূত্রে অসৎ এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে। তার রিপোর্টের ভিত্তিতে লোকটির চাকরি যায়। লোকটির বহু অনুনয় সত্ত্বেও সেই রিপোর্ট বহাল রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত লোকটি অফিসের ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। দফতরের উপরওয়ালা হিসাবে মিস্টার মিত্র ঠিকই করেছিল। কিন্তু তার বিবেক তাকে শান্তি দেয়নি। সে ভাবত লোকটির মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। তার ঘুম বিঘ্নিত হত স্বপ্নে সেই লোকটিকে দেখে। প্রাণপণে সে কর্মচারীদের ভালোবাসতে চাইত। সে কাজে তার কোন ফাঁকি ছিল না। তথাপি তার মনের শান্তি ফিরে আসেনি কোনোদিন। শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপরে দেখা যায় লকাপে সহস্র অসুবিধার মধ্যেও সে শান্তিতে ঘুমোতে পারে। নাটকটির মূল বিষয় স্পষ্ট হয়েছে লোকটি সংলাপে সে মিস্টার মিত্রকে বলেছে —"আপনি অন্যের ভালো চান, ভালো করতে চান কিন্তু তার সীমা আছে, শেষ পর্যন্ত যাওয়ার মত সাচ্চা মানুষ আপনি নন।" বস্তুত সৎ মানুষ পৃথিবীতে খুবই কম। ভালো-মন্দ নিয়েই মানুষের জীবন। মানুষ সবসময়ই যথার্থ সৎ হয়ে উঠতে চায় কিন্তু পরিবেশ এবং পরিস্থিতির চাপে অনেক সময়ই তা সম্ভব হয় না। নাটকটিতে সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।

'কৌটো'(২০০৭): মোহিত চট্টোপাধ্যায় সব সময়ই তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে যাবতীয় বিপন্নতা অতিক্রম করে আপন শক্তিতে উজ্জীবিত নিজস্ব সত্তার জাগরণ দেখাতে চেয়েছিলেন। 'কৌটো' সেই ধরনের একটি নাটক। নাটকটি প্রতীকধর্মী। এখানে আছে তিনটি চরিত্র– প্রৌঢ় এবং দুই যুবক। প্রথম যুবক তথ্যচিত্র নির্মাতা, দ্বিতীয় শিল্পী। প্রৌঢ় এই দুজন সাধারণ শিল্পীর ভিতরের সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে চায়, তাদের মানসিক শক্তির সম্যক বিকাশ দেখতে চায়। ক্ষমতা সমস্ত মানুষের ভেতরেই আছে। প্রয়োজন কেবল সাহস ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে সেটাকে জাগ্রত করে তোলা। প্রৌঢ়ের মতে প্রত্যেকেরই যথেষ্ট প্রতিভা আছে। এটা কোন দুর্লভ বস্তু নয়, যা দুর্লভ তা হচ্ছে যথেষ্ট দৃঢ় প্রত্যয় এবং সাহস নিয়ে তা ব্যবহার করা। বস্তুত আত্মবিশ্বাসের অভাব মধ্যবিত্তের বহু সংকটের উৎস। দুই যুবকের মধ্যে কিছুতেই আত্মবিশ্বাস জাগে না। প্রৌঢ় তাদের মস্তিষ্ক আকৃতির একটি কৌটো দিতে চায়। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে তারা আগ্রহী হয়। কিন্তু তারা চায় কৌটোটিত জাদু ক্ষমতার সাহায্যে তাদের স্বপ্ন সফল করবে। কিন্তু প্রৌঢ় লোকটি তাতে রাজি নয়। ফলে কৌটোটি তার কাছে শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। নাটকের শেষে দেখা যায় বিমূঢ় দুই যুবকের সামনে কৌটো থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অলৌকিক দ্যুতি। নাটকের লক্ষ মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধন। আত্মশক্তি অনেকটাই নির্ভর করে মানসিকতার উপর। মনের ক্ষমতাতেই মানুষ নিজের সব স্বপ্ন সফল করে তুলতে পারে। সে কারণেই কৌটোটির গড়ন ও ওজন মানুষের মস্তিষ্কের মতো। কিন্তু মানুষ সাধারণত এই মস্তিষ্ক শক্তির ব্যবহারের শ্রম স্বীকার করতে চায় না। তার কাম্য কম শ্রমে, সহজে প্রায় অলৌকিকভাবে সফলতা লাভ করা। সেই চাওয়া প্রায়শই মানুষকে মানসিক দিক থেকে দুর্বল করে তোলে মানুষকে। তার সত্তা খুঁজে পায় না বিকাশের স্বাভাবিক পথ। এ চাওয়া মানব অস্তিত্বকে মূল্যহীন করে তোলে। সেই চাওয়ার অর্থহীনতা এই নাটকটিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

'হীরামন' নাটকটি ২০০৭ সালে 'স্যাস' সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত, নাট্যচিন্তা ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নির্বাচিত নাটক সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'হীরামন' নাটকটির কাহিনি গড়ে উঠেছে চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে তিনজন মানুষ— জেঠু শুভ ও কণা এবং একটি পাখি হীরামন। নাটকে দেখা যায় মা-বাবা হারা অসহায় শুভকে অথর্ব, পঙ্গু বৃদ্ধ জেঠু প্রতিপালন করে। তিনি শুভকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরি করতে দেয় না, তাকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করায়। শুভ জেঠুর একমাত্র সহায়। সে জেঠুকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে চারিদিক ঘোরায়। শুভর যাতে মন বিগড়ে না যায় তার জন্য কারো সঙ্গে মেলামেশাকে জেঠু পছন্দ করেন না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী শুভর একমাত্র দুনিয়া জেঠু। জেঠুকে ছাড়া সে কিছু ভাবতে পারে না, জেঠু যা বলে সে তাই করে। জেঠুর একটি পোষা পাখি রয়েছে, যার নাম হীরামন। পাখিটি সোনালি রঙ করা খাঁচায় বন্দী থাকে আর সারাদিন শুভর সামনে— 'যা করেছি তোর ভালোর জন্যই করেছি, সবই তোর ভালো চেয়ে' শেখানো বুলিগুলি অবিকল মানুষের ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে আওড়াতে থাকে। শুভ পাখিটিকে সহ্য করতে পারে না। পাখিটি তাকে মনে করিয়ে দেয় যে জেঠু তার একমাত্র সহায়, জেঠু তার কল্যাণের জন্যই সব কিছু করেছেন। জেঠু শুভর কাছ থেকে দাসত্বের চূড়ান্ত আনুগত্য আদায় করতে চায়। তিনি নিজেকে dictator ভাবেন। একটা দেশে dictator হতে পারেননি তাই ঘরটাই তার সাম্রাজ্য- শুভ তার একমাত্র প্রজা। জেঠুর শক্তির জোর খাটে একমাত্র শুভর উপর। তিনি শুভকে আদর করে জেলিফিশ বলে। শুভ অথর্ব, বৃদ্ধ জেঠুর জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় পাথর কিংবা ভেড়া হয়ে আছে। ন্যায় ও ধর্মশাস্ত্রে মতি থাকার জন্য তাকে জেঠু শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠের উপদেশ দেন। এই সূত্রে লাইব্রেরিয়ান কণার সঙ্গে শুভর বন্ধুত্ব হয়। জেঠুর সঙ্গে কণার পরিচয় করানোর জন্য বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে। কণার সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে নিজের মধ্যে আত্মশক্তি অনুভব করে শুভ। সে মুক্তি পেতে চায়। জেঠু কণার সঙ্গে শুভর বন্ধুত্বকে মেনে নিতে পারেন না। কণার সামনের শুভকে

দিয়ে দাসত্বের চূড়ান্ত আনুগত্যের নমুনা আদায় করেন জেঠু। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা করতে বাধ্য হয়। পরক্ষণেই শুভ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। প্রথমে সে হীরামন পাখিকে গলাটিপে হত্যা করে। হীরামন ছিল জেঠুর প্রাণ-আত্মা। হীরামনের সঙ্গে সঙ্গে জেঠুও মৃতবৎ হয়ে পড়ে। এখানেই নাটকের যবনিকা পতন ঘটে।

'রাজরক্ত' নাটক থেকে তাঁর এই ব্যতিক্রমী নাট্যফর্মের পর্বান্তর ঘটে। পরবর্তী ধারার নাটকগুলির বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নাটককারের ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। তাঁর পরবর্তী ধারার অন্যতম একটি নাটক 'তোতারাম' (১৯৮৬)।

সুধীন. এন. ঘোষের 'Fairy tales from India'র একটি লোককথার ছায়া অবলম্বন করে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'তোতারাম' নাটকটি রচনা করেন। ১৯৮৬ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুর কল্লোল আমন্ত্রিত প্রথম অভিনয়। 'সমীক্ষণ' নাট্যদলের চতুর্থ প্রযোজনা। নির্দেশনায় ছিলেন পঙ্কজ মুন্সি। ১৯৮৬ সালে 'তোতারাম' নাটকটির জন্য পঙ্কজ মুন্সী পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বিশিষ্ট পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে 'ঋতিক কুমার ঘটক' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। পরে নাটকটি নাট্য 'সমীক্ষণ' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই নাটকে কোন অঙ্ক বিভাগ নেই, ১ থেকে ১৪ সংখ্যা দিয়ে দৃশ্যবিভাগ। ৪র্থ দৃশ্যের পর বিরতি অংশ। ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত দৃশ্য বিভাগে নাট্য ঘটনার বিস্তার। তোতারাম, ময়ূরী (তোতারামের স্ত্রী), ভজু (ময়ূরীর বাপ-মা মরা একমাত্র ভাই), বক্সীবাবা (মন্ত্রতন্ত্র জানা বাবাজী), বক্সীবাবার ভক্ত ও অন্যান্য কয়েকটি চরিত্র নিয়ে রচিত এই নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে – পাপ-পুণ্য বোধ সম্পন্ন ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে সদাসতর্ক সৎ সবজি বিক্রেতা তোতারাম সহজ সরল ভাবে জীবন কাটাতে চায়। তোতারাম বিশ্বাস করে সবজি বিক্রেতা হিসাবে ক্রেতাকে ঠকানো পাপ। এই মানুষটাই স্ত্রী ময়ূরী ও শ্যালক ভজুর প্ররোচনায়, অবস্থার চাপে বক্সীবাবার দেওয়া মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা পাপের সঙ্গে আপোষ করে। স্ত্রীকে সুখী করতে বাবাজী সেজে লোক

ঠকাতে শুরু করে। কাকতালীয় ভাবে কতকগুলি ঘটনার সংঘটনে তোতারাম অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। চারিদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়লে পর রাজ দরবারে রাজজ্যোতিষ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আসে। রাজা তাকে রাজজ্যোতিষ বলে ঘোষণা করলেও তোতারাম এই পদের পরিবর্তে রাজার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। সে তার অর্জিত ধনসম্পত্তি দিয়ে একটা অন্নসত্র খুলতে চায় – যেখানে নগরের নিরন্ন উপোষী মানুষ এলে তাদের সঙ্গে দু-মুঠো খেতে পারে এবং সে যেন এই কাজ সর্বশক্তি দিয়ে করতে পারে।

মঞ্চে অভিনয় করে নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্র। নাট্যকার থাকেন নেপথ্যে। নাট্যকার তাঁর জীবনদর্শন দিয়ে সৃষ্টি করেন নাটকের বিষয়, চরিত্র। মানুষের কল্যাণকামী শুভবোধসম্পন্ন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় আজীবন মানুষ ও মানব সমাজের হিতসাধনের নিমিত্তে শিল্পসৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই মানবতাবোধের আলোকে সৃষ্ট ‘তোতারাম’ নাটকের নাম চরিত্রটি। ‘তোতারাম’ নাটকটি তাঁর নাট্যজীবনের ধারায় বিশিষ্ট, এ প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যসংকলের ভূমিকায় লিখেছেন “আশির দশকে এসে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে, সমীক্ষণ-এর একটি পুস্তিকায় তিনি লিখেওছেন, ‘আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের বেশির ভাগ নাটকের আবেদন দর্শকের বুদ্ধি ও মননের কাছে। একারণেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গ্রুপ থিয়েটারের বড় পৃষ্ঠপোষক। মানুষের জীবনে বুদ্ধি এবং মনন মহার্ঘ সন্দেহ নেই। কিন্তু এদিকে সর্বাধিক মনস্ক হয়ে আমরা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করায় তেমন আগ্রহী নই।... তার ফলে একদিকে যেমন নাটক প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠতে পারেনি অন্যদিকে শিক্ষিত শ্রেণীর বাইরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে নাটকের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। নাটকের দর্শক কমে যাবার এও একটা কারণ। এ কারণেই মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে এমন সহজ সরল একটা নাটক লেখার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে অনেকদিন ধরেই লালিত হচ্ছিল।’ ‘তোতারাম’

প্রসঙ্গে কথাটা বললেও নাটককে সহজ করার এই প্রয়াস 'স্বদেশী নকসা' থেকেই শুরু হয়ে গেছে।"(নাট্যসংকলের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৯)

নাটকের বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠবে নাটককারের মানবজীবন সম্পর্কিত মূলগত ভাবনা। 'রাজরক্ত' পূর্ববর্তী নাটকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে নাট্যরীতি গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালের নাটক রচনায় তিনি সরে এসেছিলেন। 'তোতারাম' নাটকে তিনি দেশীয় লোকজফর্ম ব্যবহার করলেন। বাস্তব আর জাদু তথা মন্ত্র-তন্ত্র নাটকের আখ্যানবস্তুতে প্রাধান্য লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী ষাট থেকে আশির দশক ছিল চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকটের কাল। 'তোতারাম' নাটক ১৯৮৬ সালে লেখা। এই নাটকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক সংকটের পরিচয় রয়েছে। নাটকের শুরুতে দেখা যায়- বক্সীবাবা আর তার ভক্ত 'পথের ধারে দুই গেজেল' কলকে ধরে গাঁজায় টান দিচ্ছে। ভক্তটি গান ধরেছে 'ভবের হাটে বসে আছে মহাজন, বক্সীবাবা তুষ্ট হলে, কর্ম বুঝে দেয় বেতন।' নাটককার দেখিয়েছেন কিভাবে লোকঠকানো জাঁতাকলে মানুষ পিষ্ট হচ্ছে। নাটকে তার এক ছোট্ট নমুনা, বক্সীবাবার ভক্তটি দমভোর টান দিয়ে 'কেষ্ট ঠাকুরের মতো দুলে যাচ্ছে'। ভক্তটিকে ধাতস্থ হবার জন্য সামনের পুকুরে জল খেয়ে আসতে বলে। ভক্তটি একগাছা লাঠি ধরে যাবার কথা বললে বক্সীবাবা ভক্তটির বাঁ হাতের একটা আঙুল ডান হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দিয়া বলে- 'নে লাঠি ধরে চলে যা'। ভক্তটি সে ভাবেই চলে যায়। আবার তোতারামের শ্যালক ভজু মুরগি, দই এর ভাঁড় ও অন্যান্য সবজি গামছায় ঝুলিয়ে 'খোলতাই মেজাজে' কুটুম বাড়ি যেতে যতে গান ধরে-

> "ফাগুন মাসে আগুন এসে মন পোড়াতে লেগেছে
> ফুলের কুঁড়ি মুচকি হেসে পাপড়িগুলো মেলেছে-
> মনের সখি দেখ চেয়ে তোর মনচোরা যে এসেছে
> মৌচাকেতে মৌ ধরে না একটুখানি চেয়েছে।"

ভজু গানটি অন্য কাউকে শোনাতে চেয়েছে। পথে ভজুর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে বক্সীবাবার। ভজু বক্সীবাবার কাছে বলে সে তাঁতিপাড়ার চম্পা নামে মেয়েটিকে ভালোবাসে, কিন্তু চম্পার বাপের ঠেঙানিতে ভিন গাঁয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এখন সে ফিরে এসেছে – এটা চম্পাকে জানান দিতে গানটা ধরেছে। ভজু নিজের সম্পর্কে বলে- তার বাপ ফাঁকা ট্যাঁক নিয়ে ভবসংসার ছেড়ে পালিয়েছে। এখন সে অনাথ। কাজ কর্মে গা গতর নাড়াতে হয় বলে ওপথে সে যায়নি। কুটুমবাড়ি যায়, তাদের ঘাড়ে বসে খেয়ে এখন সে ভালোই আছে। এ গাঁয়ে তোতারাম তার ভগ্নীপতি। সবজি বিক্রেতা তোতারাম সম্পর্কে বক্সীবাবার মত ' ও তোতা ! বোকার বেহদ্দটা!' ভজুর কথায় তোতারাম সম্পর্কে জানা যায় – 'মানুষটা ভালো বলে তারে বোকা বলছো? সব তো জোচ্চোত। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না –মালে ওজনে সে জোচ্চুরি করেছে!' একথার উত্তরে বক্সীবাবার কথা থেকে তৎকালীন সমাজচিত্রের এক বাস্তবরূপ ধরা পড়ে। তিনি বলেন – 'ঐ জন্যই ব্যাটা বোকার বেহদ্দ রে। ঠক বাবাজীর দেশে সাধু হয়ে বসে থাকলে হাঁড়ি চড়বে না। চোখের জলে পেট ভরাতে হবে।' নাটকের মধ্যে এমন অনেক সংলাপ রয়েছে যেগুলি ক্লেদাক্ত পঙ্কিল অসৎ সমাজচিত্রকে তুলে ধরে। ২য় দৃশ্যে বক্সীবাবাকে বলতে শোনা যায় – '... পৃথিবীটা এখন উল্টোদিকে ঘুরছে।যে যত চালাক তার তত পয়সা, যে যত সাধু তার তত দুঃখু। চারদিকে চেয়ে কি দেখিস? পয়সা হচ্ছে অথচ ঠকাচ্ছে না এমন মানুষ দেখেছিস? তুই কি দুনিয়া ছাড়া হবি?' এই পৃথিবীটাকে কেউ ক্লেদাক্ত পঙ্কিল হাতে নষ্ট করে দেবে তা নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় কখনো মেনে নিতে পারেননি। এরকম এক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তোতারাম চরিত্রের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। তোতারাম চরিত্রের বিশ্লেষণে নাটককারের অভিপ্রায় উপলব্ধ হতে পারে।

তোতারাম চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের আখ্যান ও চরিত্রগুলি আবর্তিত । তোতারাম আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে দুর্বল হলেও মনের দিক থেকে ছিল সৎ

ও নিষ্পাপ। নাটকে দেখি তার সম্পর্কে বেশ কিছু বিশেষণ, ভজুর কাছে সে সৎচরিত্রের, বক্সীবাব বলে বোকার বেহদ্দ। নাটকের দৃশ্যগুলিতে ক্রমান্বয়ে তার মানবিক গুণাবলির পরিচয় ফুটে উঠে। স্ত্রী ময়ূরীর একমাত্র ভাই ভজু,চাল-চুলাহীন অনাথ, তার উপর আলসের গাছ। ভজু তোতার নামে ধার করে বাজার থেকে জিনিসপত্র কেনে। তার ফলে তোতার সারাদিনের উপার্জন ধার মেটাতেই নিঃশেষ হয়। এতে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তোতা ভজুকে বিশেষ গালমন্দ করতে পারে না। ভজু সম্পর্কে তোতার বক্তব্য- 'সে কেমন ছেলে আমারে চিনিও না। কাজকম্ম করবে না – কিন্তু নোলাটি তার কম না! যদ্দিন ছিল বাজার ঘুরে আমার নাম করে রোজ এটা সেটা গিলতো আর আমারে দেনা শুধতে হতো। তোমারে বলিনি। বললে বাপ-মা মরা এক মাত্তর ভাই বলে কান্না জুড়বে।' ভজুর এই বেআক্কেল কাণ্ডে তার অভাবের সংসার অচল হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে সে। তাছাড়া ভজু যে কেবল তোতাদাদার মান না খোয়ানোর জন্য আনেনি সেটা বুঝতে পারে তোতা। ভজু চম্পার টানে তার দিদি বাড়িতে এসেছে। তোতার খাতিরেই ভজু চম্পার বাপ ব্রজের হাত থেকে রক্ষা পায়। আবার ভজু যখন বলে বক্সীবাবা তোতার বাড়িতে খেতে আসবে তোতা তাতে অমঙ্গল ঘটার আশঙ্কা করে। বক্সীবাবা তোতার কাছে 'মহা ফেরেববাজ লোক' হিসেবে পরিচিত। বক্সীবাবা তোতাকে মন্ত্র দিয়ে বড়লোক করে দেবার জন্য আসে। ভজুই তার জন্য বক্সীবাবাকে বলেছিল। বক্সীবাবা প্রথমে ভজুর বুদ্ধি আর সাহস দেখে তাকে বড়লোক করতে চাইলে ভজু বলে – 'বড়লোক করে আমারে বিপদে ফেলো না বাবা। ঐ পয়সা সামলানো বড্ড ঝক্কি! গা গতর নাড়াতে হয়। দুচ্চিন্তা বাড়ে। বললাম না, আমি কুটুম খুঁজে বেড়াই। কুটুম পেলে তাদের ঘাড়ে বসে খাই। বরং তুমি আমার তোতাদাদারে বড়লোক করে দাও। আমি তার ঘাড়ে বসে মজা মেরে গতর ফুঁ দিয়ে খাবো। সে আমারে তাড়াবে না আমিও নড়বো না'। বক্সীবাবা তোতাকে মন্ত্র দিয়ে বড়লোক করতে চাইলে তোতারাম কোনো অনুচিত কাজ করতে পারবে না বলে

জানায়। এ প্রসঙ্গে তার উক্তি – ‘আজ পর্যন্ত কাউরে আমি ঠকাইনি। হাজার মানুষের পিঠে কলকের ছাপ- সবাই জামার তলায় গা ঢেকে চলে- আমার পিঠে ছাপ পড়েনি। আমি খালি গায়ে বুক টান করে হাঁটি। ট্যাঁকে আমার পয়সা নেই, কিনু মনে আমার বিস্তর সুখ। রাজার মতো পা ফেলে, বুক বাজিয়ে হাঁটতে পারি। ঠকবাজি করলে তোতা পারবো না।’ কিন্তু তার এই ন্যায়-নিষ্ঠা, চারিত্রিক দৃঢ়তা বাস্তব পরিস্থিতির চাপে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। বক্সীবাবার চোখে চোখ রাখতেই তোতা সম্মোহিত হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে সাজাতে, ঘরকে সাজাতে, সংসারে সুখের জন্য সর্বোপরি স্ত্রী ময়ূরী ও শ্যালক ভজুর প্ররোচনায়, হয়তো খানিকটা স্ত্রীর সংসার ছেড়ে চলে যাবার ভয়ের কারণে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়। ফলে তার মধ্যে বৈপরীত্যমূলক আচরণ দেখা দেয়। তার প্রমাণ তোতারামের সংলাপসহ একটা গানের মধ্যে ধড়া পড়ে- ‘তোতারামের মরণ হলো এবার আমি ধোঁকারাম। ধোঁকা দেবো মানুষেরে – এবার আমি অন্য মানুষ। ভজু গলায় মালা পরায়

তোতার গলায় পড়লো ফাঁসি
বাজলো পাপের মোহন বাঁশি
শোনরে তোরা জগৎবাসী
লোভের জ্বালা সর্বনাশী!
যে ধন আমি ভালোবাসি-
স্রোতের টানে যায় ভাসি।
গেল আলো, চাঁদের হাসি
রইলো দুঃখ রাশি রাশি।”

এর পরেই তোতারামকে দেখা যায় গণকঠাকুরের বেশে। তোতারামের নতুন সাজ এবং দিনে দুপুরে নীল আকাশে তারা দেখার কথা শুনে গ্রামের নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষ বলে – ‘চিরকাল ভালো মানুষের কপাল পোড়ে। নইলে অমন সজ্জন মানুষটার এমন

হাল হয়!’ তোতারাম তাদের বলে ভগবানের আদেশে সব হচ্ছে। যেমন এই ভগবানের ইচ্ছাতেই কুৎসিত শুঁয়োপোকা প্রজাপতিতে পরিণত হয়। তোতারামের পাওয়া এই স্বপ্নাদেশের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজার মণিকার লাড্ডু সিং এই স্বপ্নাদেশের কথা শুনেই তোতারামের কাছে আসে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান রত্ন হীরের হদিশ পেতে। খুঁজে দিতে প্রলে দুইশত স্বর্ণমুদ্রা পাবে না হলে চ্যালাশুদ্ধ রাজার শূলে চড়তে হবে। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখায় অন্য সব বড় বড় জ্যোতিষ ব্যর্থ হয়েছে, তাদের কোনো শাস্তি হল না। তার মতো মুখ্যু মানুষ না পারলে শাস্তি হবার কথা নয়। তোতারামের মতো নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের কোনো যুক্তি কেউ মানবে না তা স্বাভাবিক। লাড্ডু সিংও মানেনি। তার বক্তব্য – ‘তারা না পারলেও ভণ্ড নয়, রাতারাতি তোর মতো জ্যোতিষ সেজে বসেনি। ... এ সময় ধাপ্পাবাজি আমি সইবো না।’ অন্যায়-পাপের পথ যে কত মারাত্মক তা বুঝতে পারে ভজুও। কিন্তু ‘রাখে হরি মারে কে’। তোতারাম এ যাত্রায় রক্ষা পায় তার ভগবানের স্বপ্নাদেশ পাওয়া হাতিয়ারে। হীরেটি লাড্ডু সিং এর স্ত্রী নিয়েছিল তা ঘটনাচক্রে জানা যায়। ফলস্বরূপ লাড্ডু সিং ও তার স্ত্রী উভয়ের কাছ থেকে দুই শত মোহর ও দুই শত স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে যায় তোতা। এতে ময়ূরী মন পেখম তুলে নাচতে শুরু করে। ময়ূরী ও তার ভাই ভজুর লোভ বেড়ে যায়। ময়ূরী সাতমহলা বাড়ির স্বপ্ন দেখে রাতারাতি। কিন্তু তোতারাম উপলব্ধি করে ‘লভে পাপ, পাপে মৃত্যু’। তার মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এই পাপের কথাতেই আর এক সমস্যার সমাধান করে ফেলে তোতারাম। এক শেঠজীর স্ত্রীর খোয়া যাওয়া গলার হার খুঁজে দেয়। তোতা আগন্তুক এক মহিলাকে শাড়িতে আগুন লাগার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বলে শাড়ি, আর মহিলাটি ভাবে তোতারাম তার হারিয়ে যাওয়া হারের খোঁজ বলেছে। তোতারামের সহায়তায় শেঠজী ও তার স্ত্রীর সম্পর্ক জোড়া লাগে। এতে তোতারামকে শুধু পরোপকারী নয় পরের দুঃখে নিজেকে সমব্যাথী মনে হয়। এতে তার মানুষের মঙ্গল

কামনার দিক ধরা পড়ে। বোঝা যায় বিপন্ন অসহায় লাঞ্ছিত মানুষকে সাহায্য করার মানবিক গুণের পরিচয়।

শেঠজী ও তার স্ত্রীর সম্পর্কে জোড়া লাগার মতো কাজ চম্পার কাছে অসাধ্য সাধন বলে মনে হলেও তোতারাম অন্য কথা বলে। তার মতে –'মোহরের চেয়ে মনের দাম বেশি, এ কথা ক'জন বোঝে? মানুষের মুখের মধ্যে আমি তার অন্তরখানারে দেখতে পাই।' লোক ঠকানো কাজ থেকে মনটাকে বাঁচাতে চায়, সে নিজেকে ভণ্ড ঠগ মনে করে। পাপে সে জরজর হয়ে যাচ্ছে মনে করে। তার প্রাণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। এরকম পরিস্থিতিতে অন্য কোনো মানুষ তার পাশে দাঁড়ালে তবে সে তার মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে। তোতারাম নাটকে দেখি চম্পা বুঝতে পারে তোতার মনের অবস্থা। চম্পার এই সহমর্মীতায় তোতা জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়। সংকল্প করে আর এ কাজ সে করবে না। কিন্তু পাপের ফাঁস তার পেছন পেছন ঘোরে। রাজার আদেশে তাকে আবার গণনায় বসতে হয়। রাজার চুরি হয়ে যাওয়া চল্লিশটা পেটিকার সন্ধান চল্লিশ দিনের মধ্যে খুঁজে দিতে না পারলে গর্দান দিতে হবে। পাপের ষোলোকলা পূর্ণ হবার উপক্রম। মনে প্রাণে এই আদেশকে নিয়তির বিচার বলে শিরোধার্য করে সে । কিন্তু কাকতালীয় ভাবে এমন কঠিনতর সমস্যার সমাধান ঘটে। রাজা তোতারামকে রাজ জ্যোতিষের শিরোপা প্রদান করে। তোতারাম তার পরিবর্তে অন্নসত্র খুলে নগরের উপোষী মানুষের সেবা করার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। রাজার আদেশ তাকে স্বাধীন মুক্ত জীবনে বাঁচতে সাহায্য করে। এখানেই নাটকের সমাপ্তি, তোতারাম চরিত্রের পূর্ণতাপ্রাপ্তি।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ নাট্যাঙ্গিকের মাধ্যমে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'তোতারাম' নাটকে তাঁর সমকাল ও সামাজিক সমস্যা সংকটকে শিল্পীত ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের অনুসন্ধান করেছেন নাটককার – এ নাটকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য-

শিব-সুন্দরের পূজারী শিল্পী মাত্রই মানব কল্যাণকামী। 'তোতারাম' নাটকে তোতারাম চরিত্রের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যবোধও চারিত্রিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শুভ হৃদয়ানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'তোতারাম' নাটকে মানবিক মূল্যবোধের কাহিনি বর্ণিত। অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থায় মানবিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন তোতারাম চরিত্রের মাধ্যমে।

বর্তমান অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার গভীর সমস্যার এক নিদারুণ সত্যকে অঙ্কন করেছেন নাটককার মোহিত তাঁর 'অক্টোপাস লিমিটেড' (১৯৯৭) একাঙ্ক নাটকটিতে। নাটকে তিনি দেখিয়েছেন মানুষ কিভাবে বিজ্ঞাপনরূপী অক্টোপাসের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছে। একটি ছেলে ও মেয়ে, এজেন্ট, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, লোকটি, দ্বিতীয় এজেন্ট এই চরিত্রগুলি নিয়ে লেখা নাটকের কাহিনিতে রয়েছে- একটি পার্কের বেঞ্চির মাঝখানে স্যুট বুট পরা এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক এটাচি কেস কোলে করে দূরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রয়েছে। বিকেলে পার্কে আসে একটি বেকার ছেলে ও মেয়ে। তারা ভাজা বাদাম খেতে খেতে তাদের কল্পনার রঙে রাঙানো নানা স্বপ্নের কথা বলে অপূর্ণ সাধ পূরণ করে। ছেলে মেয়ে দুটি সাধ্যের অভাবে বিয়ের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও করতে পারছে। লোকটি তাদের সব কথা শুনে। লোকটি আসলে বিখ্যাত অক্টোপাস কোম্পানির নাম্বার ওয়ান এজেন্ট। লোকটি তার বসকে ফোন করে কোম্পানির স্পনসরশিপে তাদের বিয়ে দিতে চাওয়ার কথা বলে। এবং এই বিয়েতে তাদেরকে একটি লোভনীয় অফার দেওয়ার কথা জানায় কোম্পানির এজেন্ট। এই প্রস্তাবে তারা রাজি হয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যায়। নাটকের দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় রেজিস্ট্রেশন অফিসে বরকনের সাজ পোশাক থেকে মাথার টোপরেও কোম্পানির লোগো আটকানো থাকে। অক্টোপাস লিমিটেডের দুনম্বর কোম্পানি খবর পেয়ে তারা এই বিয়েতে আরও লাভজনক অফার দেয়। নম্বর ওয়ান কোম্পানির দেওয়া অফারের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যতের সন্তানকেও

স্পন্সর দিতে চায়। এই ভাবে দুই এজেন্টের মধ্যে নিলামে বিয়ের দর কষাকষির মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন ঘটে। নাটককারের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সারাবিশ্বের সমস্ত কিছুই কোম্পানির স্পন্সর শিল্পের দ্বারা চালিত হওয়ার ঘটনা। কৌতুক মেশানো এই নাটকের কাহিনিতে অক্টোপাসের রূপকে স্পন্সরশিপের ব্যবসায়িক বন্ধনে আবদ্ধ অবক্ষয়িত সমাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন নাটককার।

Max Frisch এর 'The Fire-Raiser' নাটকের অনুসরণে লেখা 'কাল বা পরশু' একাঙ্ক নাটকটিতে রাজনৈতিক মাত্রা প্রাধান্য লাভ করেছে। ক্ষমতাভোগী রাজনৈতিক নেতাদের অসৎ মানসিকতার কারণে বর্তমান সমাজে উচ্চ শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় বেকারত্বের শিকার হয়। সর্বহারা এই শিক্ষিত বেকার যুব সমাজ বোমার ন্যায় বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য তাপস নামক এক রাজনৈতিক কর্মীর বাড়িতে তার অসুস্থ ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে এক খেলা খেলে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত, উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। নাটককারের মানবিকবোধের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত এই একাঙ্কটি। নাটকটি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় মঞ্চসফল নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম।

'বাজপাখি' (১৯৬৯) নাটকটি নাটককারের একটি বিমূর্ত ভাবনার নাটক। পাঁচটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী চরিত্র নিয়ে লেখা একটি দৃশ্যে বর্ণিত নাটকটির বিষয়বস্তুতে রয়েছে- অফিসে যাবার জন্য মাছিমারা কেরানি কল্যাণ তৈরি হচ্ছিল। তার ছোট ভাই সুব্রত বিকেলে মিটিং-এর জন্য একটি বাজপাখি তৈরি করে নিয়ে টেবিলে রাখে। বাজপাখিটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন সমস্ত বিশ্বটাকে গ্রাস করতে চায়। পাখির ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে সকলেই সংকুচিত হয়। সদানন্দবাবু প্রতিদিন সুদীর্ঘ সময় ধরে বাড়ির ফোনটা ব্যবহার করার কল্যাণ বিরক্ত হয়। একটু নির্জনতা সুযোগ পেলে কল্যাণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বাজপাখিটার দিকে। কল্যাণ আপন-মনে কোনো সুদূরের বিশ্বপিতার সঙ্গে কথা বলে। সে নিজের সম্পর্কে বলে তার কোন সামর্থ্য নেই, তার স্ত্রীকে সে সুখী করতে পারেনি।

পৃথিবীতে কাউকে সুখী করতে পারেনি সে। দয়া করে তাকে কিছু করার সুযোগ দিতে প্রার্থনা জানায়। সুদূরের বিশ্বপিতাকে ফোন করার পর কল্যাণ এক অন্য মানুষ হয়ে যায়। তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে। তার এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে সকলেই ভয় পেয়ে যায়। পুরনো দিনের মত 'মহাদেবের' ভার পরার ভয় করে সবাই। তার সেজো ভাই পবিত্র ডাক্তার, কিন্তু সেও কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। কল্যাণ ধীরে সকলকে তার পরিবর্তনের কারণ জানায়। সে সমস্ত পৃথিবীর হয়ে বিশ্ব নিয়ন্তার সঙ্গে কথা বলবে। সকলেই আনন্দে হইচই শুরু করে দেয়। সদান্দবাবু, সাংবাদিক ফটোগ্রাফার সেন বাবু সকলেই আকাঙ্ক্ষিত শুভ ক্ষণটির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সকলেই জানতে চায় কি প্রশ্ন রাখবে কল্যাণ বিশ্বের মহান নেতার কাছে। কিন্তু কল্যাণ বিভ্রান্ত হয়। মহান নেতার উপযুক্ত কোনো প্রশ্ন সে জানে না। সে সকলকে অনুরোধ করে মহান নেতার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু সকলেই কল্যাণের মতো নিজেকে উপযুক্ত মনে করে না। সকলে নিজেকে উপযুক্ত করার জন্য সময় চায় তার কাছে। নিজেদের উপযুক্ত করার সময় দাবি করে তারা। নাটকের কাহিনি, সংলাপ এবং চরিত্রের মধ্যে গণ জাগরণের ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের অস্তিত্ব সংকটের আরেকটি নাটক 'ভূত'। একটি দৃশ্য ও সাতটি পুরুষ চরিত্র নিয়ে এই নাটকের কাহিনি গড়ে উঠেছে। এ নাটকের কাহিনি থেকে জানা যায় সুদাম ও ভুবন নামে দুটি চরিত্র একটা চার বছরের পরিত্যক্ত বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে উঠে এসেছে বিনা ভাড়ায় থাকার জন্য। বাড়িটি ভূতের বাড়ি বলেই পরিচিত। সুদাম আগে এলেও সে বাড়তি টাকা দিয়ে মুটেকে সঙ্গে রাখে ভুবনের না আসা পর্যন্ত। একটা পাল্লা খোলা আলমারি চারজনের মাথায় চাপিয়ে প্রবেশ করে কুলিরা। দুজনে নিজেদের মধ্যে আর্থিক বিপর্যয়ের কথা আলোচনা করতে করতে জানতে পারে সংসারে চাপে দুজনে মৃতপ্রায়। তাদের পিছনে এসে দাঁড়ায় সংসারে চাপা পড়ে থাকা মৃত ভূত। সুদাম ও ভুবনের জীবন বৃত্তান্ত শুনে ভূতও তাদের মৃত ঘোষণা

করে এবং তাদের ছাদে উঠে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করতে বলে। ভূতের মতে ভুবন ও সুদামের মধ্যে কেবল বাঁচার মায়াটুকুই রয়েছে। তাদের অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায় ভূত। ডাক্তার চরিত্রটি তাদের নিয়ে যেতে নিষেধ করার জন্যই আসে। ডাক্তার তাদের বাঁচার মন্ত্র শিখিয়ে দেয়। বাঁচার দাবি উচ্চারণের মধ্যেই নাটকের সমাপ্তি।

১৯৭৩ সালে 'বর্ণপরিচয়' নাটকটি প্রকাশিত একটিমাত্র দৃশ্যে পাঁচটি চরিত্র নিয়ে এই নাটকের কাহিনির অগ্রগতি। নাটকের বিষয়বস্তু দেখা যায় দিশেহারা চারজান মানুষ নিষ্প্রদীপ পার্কের একটা ল্যাম্পপোস্টকে কেন্দ্র করে কেবল নিজেদের পরিচয় হারিয়ে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। হিজ হাইনেস নামক চরিত্রটির কেবল হাইতুলে তার জীবন কেটে যায়। বোমকেশ নামের বোম আর কেস উচ্চারণ থাকায় পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে সে পালিয়ে বেড়ায়। স্মাগলার চরিত্রটি ছোটবেলার আর একজন অমলিন ছবিকে বুকে করে স্মাগলিং করে। ক্লাউন চরিত্রটি ক্যাসেট বাজিয়ে শিক্ষকতা। এই ক্লাউন চরিত্রটির দ্বারা প্রথম বর্ণ বিপর্যয়ের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্ণের বিপর্যয় ঘটেছে। আমাদের কথা বলায়, আমাদের পা ফেলার ভাষায়, লড়াই ও হাই তুলবার ভাষায়। মানুষের মুক্ত বিবেকের প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয় ছেলে চরিত্রটি। তার সাহায্যে মানুষ বর্তমান সমাজের বর্ণ বিপর্যয় রোধের আশা প্রকাশ করেছেন নাটককার।

জঘন্য কুৎসিত মানুষের মধ্যেও যে সুন্দরের অস্তিত্ব বর্তমান 'সুন্দর' নাটকের মধ্যে তা তুলে ধরেছেন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান সমাজ মানুষের মন থেকে সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে গেছে। এই হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তোলার মন্ত্র 'তুমি কত সুন্দর' এর যথার্থ প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে মল্লিকা নামক চরিত্রটি। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চাকরি ইন্টারভিউ নামক এক প্রহসনের প্রতি এবং মানুষের মনের মধ্যে সুন্দরের বোধ জাগিয়ে তোলার ভিন্নমাত্রা লক্ষ্য করা যায় এই নাটকে। নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে - একটা চাকরি প্রত্যাশা নিয়ে মল্লিকা চরিত্রটি মানবকল্যাণ

সংস্থার ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু প্রচণ্ড রাশভারী প্রকৃতির মানুষ মিস্টার তরফদার দরজার ভেতরে তাকে প্রবেশ করতে দেয় না। মল্লিকাকে সাহায্য করে সৌরভ চরিত্রটি। প্রতিদিন একজন সত্যিকের বন্ধু খুঁজে বেড়ানো তার কাজ। সৌরভ মল্লিকাকে জানায় মানুষের মধ্যেই থাকা নিজস্ব রূপ খুঁজে পাওয়ার মূল মন্ত্র। নাটককারে জীবনদর্শনে ধরা পড়েছে মানুষের মধ্যে থাকা স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস। নাটকের ঘটনাক্রমে দেখা যায় মল্লিকা একে একে 'তুমি কত সুন্দর' এই মন্ত্রে উজীবিত করে তোলে। প্রথমে মল্লিকার কথা শুনে রাশভারী কুৎসিত রিসেপশনিস্ট মি. তরফদার চমকে ওঠে। তার চোখের সুন্দর দৃষ্টি কথায় সে নিজের মধ্যে এক নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। মল্লিকাকে সে সাহায্য করতে আগ্রহী হয়ে তাকে ডেপুটি ডাইরেক্টর মি. দত্তের কাছে নিয়ে যায়। মল্লিকা মিস্টার দত্তকে সুন্দরের মন্ত্র শোনায় মল্লিকার কাছে সুন্দরের কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। যখন মল্লিকা জানায় মিস্টার দত্তের মুখের কোণে চাপা হাসিটা অপূর্ব সুন্দর। মিস্টার দত্ত তখন অপার মুগ্ধ দৃষ্টিতে মল্লিকাকে আপন করে নেয় এবং নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকার প্রস্তাব দেয়। পরে ডাইরেক্টর মিস্টার দস্তিদারের মধ্যে মল্লিকা তার এক শিশুসুলভ নির্মল সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। দস্তিদারের হবু স্ত্রী প্রতিদ্বন্দ্বী মল্লিকাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেও মিস্টার দস্তিদার মল্লিকাকে হীরের আংটি পরাতে চায়। সুন্দরের এই আশ্চর্য মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মল্লিকাও তার প্রকৃত বন্ধু সৌরভকে বেছে নেয়। সৌন্দর্যময় এই পৃথিবীতে কেউ কখনো নিজেকে কুৎসিত ভাবতে চায় না। সুন্দর বলার মধ্যে অতি কুৎসিত মানুষও নিজেকে সুন্দর করে তুলে ধরতে চায়। অন্য কারোর মুখে সুন্দর কথাটা শোনার জন্য অসুন্দর মানুষও ব্যাকুল হয়ে থাকে। এর ফলে রূপহীন মানুষের যন্ত্রণা তখন সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে – এমনই এক সৌন্দর্যময় জীবনদর্শনের কথা ধরা পড়ে এ নাটকে।

বাংলা নাট্যজগতের এক শক্তিশালী নাটককার ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রায় পাঁচ দশক ধরে আধুনিক বাংলা নাট্য আন্দোলনের ধারাকে সক্রিয় রাখতে অগ্রণী

ভূমিকা পালন করেছিলেন। সময় ও সমাজের দাবি মেনেই তিনি কবিতার জগৎ থেকে নাটকের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ সংলাপ, নাট্য অঙ্গিকে কবি মোহিতকে চিনে নেওয়া যায়। তিনি বৃহৎ ও স্বল্পায়তন নাটক রচনার পাশাপাশি 'অণুনাটক' নামক এক আধুনিক নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন বাংলা নাটকের ধারায়। বাংলা নাট্যধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যাত্রাপালা ও নাটক সংঘটনের সময় মাত্রা ছিল প্রায় ছয় সাত ঘন্টা অর্থাৎ নাটক আরম্ভ হত মধ্যরাত্রে আর শেষ হত সূর্যোদয়ের প্রারম্ভে। কিন্তু বর্তমান কর্মব্যস্ত যান্ত্রিক সভ্যতায় মানব জীবনে সময়ের মূল্য অধিক পরিগণিত হওয়ায় অবসর যাপনের মাত্রা ক্রমশ সংক্ষেপিত হতে থাকে। ফলে বর্তমান সময়কালে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রগুলি ক্রীড়া ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক প্রভৃতি ক্রমশ সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করছে, পরিণত হচ্ছে অণুতে। অণুতে বিশ্বকে স্থাপন করা, আণবিক অভিব্যক্তির ক্ষুদ্র উপস্থাপনা – এই আণবিক গুরুত্ব অনুসারে এই ধরনের সৃষ্টির নাম 'অণুগল্প' বা 'অণুনাটক'। পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক নাটকের পাশাপাশি অণুনাটক রচনার সুত্রপাত ঘটে বাংলা নাটকের ধারায়।

নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য সৃজনে বার বার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের তিনি ব্যক্তি সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ 'রাজরক্ত' নাটক থেকে তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আধুনিক কালের সর্বশেষ সংযোজন অণুনাটকে পরিমিত শিল্পরূপের মধ্যে জীবনের এক বিশেষ ক্ষণকে দেখাতে চেয়েছেন। একুশ শতকে মানুষের জীবনে নানা সমস্যা সংকট আরও জটিল আকার ধারণ করে। নাটক লেখার ক্ষেত্রে এক কবিমন কাজ করে, এই কবিত্ববোধ নাটকে অন্যমাত্রা এনে দেয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মনে হচ্ছিল বাংলা নাটক একটা প্রথাসিদ্ধ বাস্তবতার পথ ধরে চলেছে। তার মধ্যে ভালো নাটক যে নেই তা নয়, কিন্তু নতুন ধারা চোখে পড়ছিল না। তাঁর নাট্যজীবন শুরু হয় উদ্ভট, কমেডি ও অ্যাবসার্ড নাটক দিয়ে। সত্তর দশকের উত্তাল

রাজনৈতিক পটভূমিতে লেখা নাটকের আঙ্গিকে রাজনৈতিক মাত্রা সচেতনভাবে প্রতিস্থাপন করলেন। পরবর্তী কালে তিনি লিখেছেন মনস্তাত্ত্বিক নাটক, হালকা হাসির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট জীবন সত্যের নাটকের পাশাপাশি বাস্তব সমস্যা ঘটিত নাটক। তিনি কখনও অবিচলভাবে এক নির্দিষ্ট ভাবের বন্ধনে আপন সৃষ্টিকে স্থিতিশীল করে রাখেননি। ক্রমশ গতিশীলতার ধারার বাংলা নাটকে তিনি অণুনাটকের বীজ সঞ্চারিত করলেন।

আমাদের দেশে বিনোদনের যে সমস্ত বিষয় ছিল তাদের মধ্যে যাত্রাপালা ও নাটক প্রায় সারারাত ধরে চলত। গতির সঙ্গে তাল মিলে চলতে গিয়ে ইউরোপের ওয়ান এ্যা প্লে, বা একাঙ্ক নাটকের উদ্ভব হয়। নাটকের সময়কাল ছিল এক ঘন্টার মতো।

আমাদের দেশের পাঁচের দশকে মফঃস্বল বাংলায় একাঙ্ক নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী সময়ে প্রযোজনার অর্থবল, লোকবল, প্রস্তুতির সময় কম হওয়ায় মানুষ আরো অল্প সময়ের নাটক দেখতে আগ্রহী হয়। আজকের ক্রীড়াজগত থেকে বিনোদনের সাহিত্যের সমস্ত জগৎ ছোট হয়ে যাচ্ছে। নাটক তার থেকে বাদ পড়তে পারে না।

বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউরোপে ঝড় তোলে দশ মিনিটের নাটক বা Microplay বা Miniplay। খুব অল্প অর্থ, লোকবল, সময়সীমার মধ্যে হয় অনুনাটকের চর্চা এবং প্রয়োগ করা চিন্তা ভাবনা। রঙ্গপট নাট্য পত্রের চতুর্থ সংখ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখলেন – "বেশ কিছু সময় ধরে ইউরোপে দশ মিনিটের নাটকের ঝড় বয়ে চলেছে, শুরুতে বোঝা যায়নি যে এই Microplay বা Miniplay এত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। এখন প্রতিযোগিতা, উৎসব এবং ইতস্তত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাটকের একটা উপভোগ অধ্যায় দশ মিনিটের নাটকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাদৃত হচ্ছে। আমাদের এখানে এধরনের নাটকের চর্চা নেই বললেই চলে। আমাদের মধ্যে

এখন ভালোভালো নাট্যকার, নির্দেশক এবং নতুন কিছু গ্রহণের জন্য উন্মুখ দর্শক রয়েছেন, আমার বিশ্বাস, এপথে এগোলে অল্প সময়ের মধ্যেই নাট্য সমাজে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। অণুনাটক নিয়ে বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বদের অভিমত ব্যাখ্যা করলে অণুনাটক সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হবে। বিখ্যাত নাট্যকার শ্রী চন্দন সেনের অণুনাটক সম্পর্কে মন্তব্য – "এক আণবিক আরম্ভের প্রস্তাবনা"। নাট্যকার শ্রী রতনকুমার ঘোষ অনুনাটকের প্রসঙ্গে বলেন – "নাটকের স্বার্থেই অনুনাটকের চর্চা ও প্রসার অবশ্য প্রয়োজন। "নাট্যকার বসন্ত ভট্টাচার্য অণুনাটক সম্পর্কে বলেন – "সময়ের টান বড় টান। মানুষ গতি চায়। দ্রুত থেকে দ্রুততর। এই অস্থির সময়ে আর বেশী করে অণুনাটক দরকার"। নাট্যকার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন – "অণুনাটক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমান্তরাল একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। অনুনাটকের চর্চা হলে বাচনে সংযম আসবে সংলাপে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হবে, ফলে নাটক সমৃদ্ধ হবে"। নাট্য গবেষক কমল সাহার ভাবনায় অণুনাটক হল – "আণবিক ও মানবিক বিস্ফোরণের অন্য নাম অনুনাটক। এর সম্ভাবনা মানে ছোটো পরিসরে একটি অখণ্ড নাট্যমুহূর্ত তৈরি করা"।

প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্বের অভিমত নিয়ে নাটককার মোহিত চট্টপাধ্যায়, নাট্যকার রতন কুমার ঘোষ মহাশয়ের আহ্বানে গত ২৯শে মার্চ ২০০৮ শনিবার ব্যারাকপুর সুকান্ত সদনে অণুনাটক বিষয়ক একটি সম্মেলনে বিভিন্ন নাট্যকর্মী ও নাট্য সংগঠকের উপস্থিতিতে বিশদ আলোচনায় "অণুনাটক" এর প্রসার ও বিকাশের জন্য অণুনাটক বিকাশ মঞ্চ গঠন করেন। পরবর্তীকালে 'অণুনাটক' বাংলা নাট্যজগতে একটি বিশেষ স্থান পায়।[২২]

"রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক, গ্রন্থের ছাত্রের পরীক্ষা, সূক্ষ্ম বিচার, পেটে ও পিঠে ইত্যাদি হেয়ালি নাটিকাগুলিতে হয়তো অণুনাটকের বীজ রয়ে গেছে। কিন্তু অণুনাটকের পূর্ণাবয়ব দিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্যেও অণুনাটকের জন্ম খুব বেশিদিনের

নয়। ১৯৮০ সালে অ্যাক্টর থিয়েটার অফ লুইভিল দশ মিনিটের নাটকের আয়োজন করেছিল। উৎসবের নাম ছিল – দ্য হিউম্যান ফেস্টিভাল অফ নিউ আমেরিকান প্লেজ। এই উৎসবের প্রোডিউসিং ডিরেক্টর ছিলেন জন জরি (John Jory). অণুনাটকের বিপুল সম্ভাবনা ও তুমুল জনপ্রিয়তার ঐতিহাসিক উৎস ছিল এই উৎসব। এই উত্তেজনামূলক নাটকের আঙ্গিক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রচলিত বড়ো ও ছোটো মাপের (পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক) নাটকের বাতাবরণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ... অণুনাটকের প্রয়োগ ক্ষেত্র মঞ্চ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়লো মাঠে-ময়দানে, পথে-ঘাটে, স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গণে, কারখানার গেটে, অফিস পাড়ায় ইত্যাদি স্থানে। কোনও বড় নাটকের আগে কিংবা কোনও বড় অনুষ্ঠানের মাঝে বা বিরতির সময় অণুনাটক মঞ্চস্থ হওয়ার ঝোঁক দেখা দিল। ডেভিড মাসেট, ক্রিস্টোফার ডুরাঙ, ক্রেইগ লুকাস, অ্যাঙ্গাম উইলসন প্রমুখ সুবিখ্যাত নাট্যকারও অণুনাটক লিখতে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

মনে রাখা জরুরি যে, কালের দাবিতেই অণুনাটকের চর্চা শুরু হয় বাংলা থিয়েটারে। একুশ শতকের প্রথম দশকেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মননে উঁকি দিয়েছিল অণুনাটক সম্পর্কিত এক নতুন নাট্যভাবনা। একুশ শতকের এ সময়ে মানুষের জীবনে নানা সমস্যা ও সঙ্কটে জর্জরিত। সম্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে মানুষ। জীবন থেকে নিঙড়ে নিচ্ছে সময়। এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে অণুনাটকের উৎপত্তি যুগেরই প্রয়োজনেই। এ যেন ক্রিকেট খেলায় টেস্ট থেকে ওয়ান ডে হয়ে টুয়েন্টি টুয়েন্টি খেলা। নাটকের ক্ষেত্রেও এ পরিবর্তন লক্ষণীয়। রাতে শুরু হয়ে যে নাটক শেষ হতো সূর্য উঠিয়ে, যে নাটক দু'ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টার কাঁটাতারে আবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ নামে। গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময়ের দাবিকে মান্যতা দিয়ে পঞ্চাশ থেকে ষাট মিনিটের একাঙ্ক নাটকের প্রচলন হয়। জেট যুগের মানুষের জীবন আরও গতিময় হওয়ায় নাটকের পরিসর কমে আসে দশ থেকে পনের মিনিটে। একুশ শতকের দর্শকও যেন উন্মুখ হয়েছিল নতুন এই নাট্যধারাকে সাদরে বরণ করে নিতে। ... ...

মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'অণুনাটক' বলতে কমপ্লিট ড্রামা বা সম্পূর্ণ নাটককেই বুঝতেন। তবে তার আয়তন একাঙ্ক বা পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় ছোটো। ... তিনি মনে করতেন, বিষয়বস্তুকে সংহত করে পরিমিত শিল্পবোধে উন্নিত করাই অণুনাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাট্যধর্ম যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরী। যেহেতু অণুনাটকের সময়সীমা দশ বা পনেরো মিনিট, সেহেতু সমস্যা বা সঙ্কট থেকে সোজাসুজি দ্বন্দ্বে চলে যাওয়াই শ্রেয়। সেখান থেকে চূড়ান্ত পরিণতিতে দ্রুত পৌঁছে যাওয়া। এক্ষেত্রে চরিত্র চিত্রণে কিংবা সংলাপ রচনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। সংলাপ হতে হবে নির্মেদ ও বাস্তবানুগ। নাটকটি দেখার পর কিংবা পাঠের শেষে দর্শক বা পাঠকের মনে যাতে অণুরণন তোলে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। ছোটোর মধ্যে বৃহৎকে দেখার যে সম্ভাবনা থাকে, সেই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে।"[২৩]

একুশ শতকের বাংলা নাট্য আন্দোলনের নবীন 'উদ্বেল তরঙ্গ' সৃষ্টিকারী অণুনাটক সম্পর্কে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান প্রাসঙ্গিক কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা গেল :

> "অণুনাটক বিদেশে Ten-minute play নামে পরিচিত। আমরা যে ঐ সময়-সীমাতেই আবদ্ধ থাকব এমন মান্যতার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, আমাদের অণুনাটক দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যে থাকলেই ভালো। তেমন বাধ্যবাধকতারও প্রয়োজন নেই, কিছু সামান্য কম-বেশি হওয়াটা যদি জরুরি হয় তা চলবে।
>
> এই সময় মেনেই চলনটাই অণুনাটকের প্রধান কথা নয়। অনেক skit এবং sketch এরকম কম সময়ের জন্য লেখা হয়। এদের কিন্তু অণুনাটক বলা যাবে না। কারণ এসব ফর্ম নাট্যমুখী সংলাপের ওপর ভর

করে রচিত, নাটকের সাধারণ ধর্ম পালন করে না। তাহলে কেমন হবে অণুনাটক ? তার কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এসব প্রশ্নের উত্তর পরিণত নাট্যকাররা জানেন। যাঁরা প্রথম এই ধারার নাটক রচনায় আগ্রহী হতে চান তাঁদের কাছে অণুনাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার নিজস্ব ধারণা কি তা সূত্রাকারে জানাচ্ছি।

১। অণুনাটক আয়তনে ছোট হলেও তাকে একটি সম্পূর্ণ নাটক [Completeplay] হয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ একটি বড় মাপের বা ১ ঘন্টার স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক যে-যে শর্ত মেনে, যে structure অনুসরণ করে রচিত হয় অণুনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই নাট্যধর্ম বজায় রেখেই চলতে হবে। তবে গঠনের সব দিকটাতেই একটা দ্রুততা থাকবে। অথচ দর্শক যেন না ভাবেন নাট্যবিষয়টিকে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। একটা শক্ত কাজ। একারণেই অণুনাটক একটা challenging dramatic format. যা দু'ঘন্টা বা এক ঘন্টায় বলা যায় তা পনের মিবিটে বলব – এটাই challenge. মনে রাখতে হবে একটি আদর্শ অণুনাটকের মধ্যে একটি miniature world স্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে এ নাটক Atomic expression of a leigtatal thing. এই আণবিক গুরুত্বকে মনে রেখেই এ ধরনের নাটকএর নাম অণুনাটক।

২। কম সময়ের নাটকে বলেই শুরুতে exposition ইত্যাদিতে সময় নষ্ট না করে কাহিনীর বা subject-এর crisis থেকেই start করা যেতে পারে। সব ধরনের নাটকেই crisis না থাকলে চলে না। এখানেও তা থাকবে। সব নাটকেই মূল চরিত্রের একটা লক্ষ্যবিন্দু থাকে, সে কিছু করতে, পেতে বা নিজস্ব পথে চলতে চায়। সেখানে যখন বাধা

আসে তখনই দেখা দেয় crisis বা সঙ্কট। তার থেকে দেখা দেয় Tension, Conflict । এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই নাটকের Action চূড়ান্ত পরিণতি বা Climactic ending-এ পৌঁছায়। অণুনাটক crisis থেকে শুরু করে এভাবেই চূড়ান্ত পরিণামের দিকে যাবে এবং তাহলেই complete play-র মার্যাদা পাবে।

নাটক যেখানে শেষ হবে তা যেন সহজ সমাধান না হয়। সঙ্কটের নিষ্পত্তি শেষে করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতাও নেই। উপসংহার open রাখাও যেতে পারে – দর্শক বা পাঠক নিজের মতো করে তা ভেবে নেবেন।

৩। এসব কারণেই আদর্শ অণুনাটক লিখতে শক্তিমান নাট্যকারের প্রয়োজন। ছোট্ট মুঠোর মধ্যে আকাশটা ধরে রাখবার মতো প্রতিভার যাদু দরকার। চাই গভীর substance and unique style। নাটকের meaningful journey-র জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাই অণুনাটকের শ্রেষ্ঠত্ব রচনা করতে পারে। মনে রাখতে হবে অণুনাটক Is not easy to write, easy to manage only. বেশিক্ষণের নাটক নয়, তবে বেশিক্ষণ যাতে দর্শকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে- তেমন অণুনাটক রচনাতেই সার্থকতা।

৪। ভয় হয়, অল্প সময়ের নাটক বলেই অনেকে জমিয়ে দেবার জন্য লঘু বিষয় নিয়ে দর্শককে হাসাতে না ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দর্শক হাসবেন- এটা বড় কথা। কিন্তু তাদের কি দিয়ে হাসালাম, হাসি ছাড়া হাসি থেকে তাঁরা আর কি পেলেন এটাও আমাদের ভাবতে হবে। সরস অণুনাটক যথেষ্ট লেখা হোক কিন্তু তা যেন সারবান হয়।

৫। অণুনাটকের কোথাও বাহুল্য থাকবে না – না সংলাপে, না চরিত্রের সংখ্যায়, না সেট ও আসবাবে। sub-plot থাকবে না, focus on one action. নাট্যবিষয় কোথাও থেমে থাকবে না – এই গতিশীলতা অণুনাটকের উপভোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।" [২৪]

বাংলায় অণুনাটক রচনাকে কেন্দ্র করে যে নাট্য আন্দলনের সূত্রপাত হয়েছিল তার পুরোধা ছিলেন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সৃষ্ট অণুনাটকগুলি বাংলা নাটকের বৈচিত্র্য ও বিকাশের ধারায় ভিন্নমাত্রা সংযোজনে কতখানি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে – তা তাঁর অণুনাটকগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হল।

'থিয়েটার রঙ্গ' নাট্যপত্রে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম (সম্ভবত) অণুনাটক 'কালো ব্যাগ'। অণুনাটকটি পরে ২০০৭ সালে 'রঙ্গপট' নাট্যপত্রে এবং ২০০৯ প্রসাদকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মঞ্চের বার্ষিক মুখপত্র 'অণুনাটক সমাচার' এ প্রকাশিত হয়। কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যচরণ ও চার দারোগা মোট পাঁচটি চরিত্র নিয়ে লেখা এই নাটকে কালো রঙের একটি ব্যাগ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। নায়ক সত্যচরণ রায় একটি কালো ব্যাগ ট্যাক্সিতে ফেলে আসেন। ব্যাগটি উদ্ধারের আশায় থানায় এসে ডায়েরি করেন এবং ট্যাক্সি নম্বরও থানায় জানায়। ব্যাগ উদ্ধার করতে গিয়ে এক থানা থেকে আর এক থানায় ঘুরতে হয় তাকে। এক সময় তিনি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েন। ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় থানায় এসে জানান – আমার যা যাবার গেছে, যা হবার হবে, আমি আর থানায় ঘুরতে পারব না। ধরে নিচ্ছি আমার কিছু হারায়নি। আমার case টা close করে দিন। শেষে চার নম্বর থানার দারোগা সত্যচরণ রায়কে দিয়ে লিখিয়ে নেয় তার কিছু হারায়নি। থানায় ঘোরার হাত থেকে রেহাই পেতে সত্যচরণ সহজ মনে লিখে দেয়। কিন্তু তার জানা ছিল না সত্যচরণের জন্য বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে। তার লিখিত বয়ান অনুযায়ী কিছু

হারায়নি। থানা সরকারী প্রতিষ্ঠান। থানাকে বিভিন্নভাবে বিব্রত করার অপরাধে তার কারাবাস হয়। ব্যাগ উদ্ধারের জন্য পুলিশের অকর্মণ্যতা, গাফিলতি, কর্তব্যে অবহেলা ও প্রতারণার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সমাজের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন নাটককার। যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে ঘুণ ধরা সেই অবনমিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে এই নাটকে। একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে রচিত এই অণুনাটক আমাদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করে।

২০১১ সালে অণুনাটক সমাচার-এর তৃতীয় সংখ্যায় 'একটি মাথা দুটি ছাতা' অণুনাটকটি ছাপা হয়। তার আগে ২০০৭ সালে রঙ্গপট নাট্যপত্রে প্রকাশিত হয়। একটি বাচ্চাছেলে, দুজন প্রৌঢ় এবং একজন প্রৌঢ় জজ চারটি চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে – পার্কের বেঞ্চে কোনো এক ব্যক্তির ফেলে যাওয়া একটি ছাতাকে নিজের হস্তগত করতে দুজন বৃদ্ধের মধ্যে লড়াই বাঁধে। একটি পরিত্যক্ত ছাতা নিয়ে টানাটানি, কাড়াকাড়িতে বিবাদরত দুই ব্যক্তির হীন মানসিকতা দেখে মীমাংসা করতে তাদের এগিয়ে আসেন এক জজসাহেব। নাট্যকার এই জজসাহেবকে আজব মানুষ হিসাবে তুলে ধরেছেন টাকা পয়সা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে উদাসীন, ডাকসাইটের এজলাসে না বসা এই জজসাহেবকে একজন আজব মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নাটককার। তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়ান। কেউ বিচার চাইলে রায় দেন। দুই বৃদ্ধ বিচার চাইলে তিনি তার রায় দিয়ে বলেন - রোদ বৃষ্টিতে কেউ দুটি ছাতা মাথায় দিয়ে চলতে পারে না। একটি মাথার জন্য একটি ছাতাই যথেষ্ট। যার একটিও নেই, এটি তার প্রাপ্য। সব দিক বিবেচনা করে তিনি দেখলেন বিবাদরত বৃদ্ধ দুটি তাদের চাহিদা মিটলেও তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বাড়তি সম্পদের দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। দুনিয়ায় অশান্তির মূলে মানুষের বাড়তির দিকে ঝোঁক। অথচ তাদের পাশেই পালিশের কাজে একটি ছেলে যার এখন স্কুলের ব্যাগ নিয়ে যাওয়ার কথা তার পরিবর্তে যাকে জুতো পালিশের বাক্স বহন করতে হচ্ছে - জজসাহেব ছাতাটি জুতো পালিশওয়ালা বাচ্চা ছেলেটিকে

দিয়েছিলেন যার একটিও নেই; ছাতাটি পেয়ে সে খুশি হয়ে চলে গেল। অণুনাটকটিতে অল্প পরিসরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষুদ্র মানসিকতা ও নীতি নৈতিকতাহীনতার খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন নাটককার। আসলে আমাদের চাহিদা পূরণ হলেও অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। বাড়তি সম্পত্তির দিকে আমাদের লোভ থাকে সব সময়। গোলমাল, হানাহানি, সংকট, বাড়তি সম্পদের প্রতি লোভ –এসব না থাকলে খুব সুন্দরভাবে গড়ে উঠত আমাদের সমাজ। অণুনাটকটিতে মধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্রতার মুখোশধারী রূপের আড়ালে নোংরা মানসিকতার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। অপরদিকে জজসাহেব চরিত্রের সততা, উদারতা, মহত্ব, বিচক্ষণতা এবং বাচ্চা ছেলেটির সরলতার মাধ্যমে নাটককারের ব্যক্তিমানসে সুপ্ত থাকা সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার অভিসন্ধি পরিস্ফুট হয়েছে শিল্পত পরিসরে।

২০০৭ সালে রঙ্গপট নাট্যপত্রে ‘মৌমাছি’ অণুনাটকটি প্রকাশিত হয়। অণুনাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ছবি। ছবির চারটি প্রাক্তন বর। বরেরা অভিব্যক্তি সহ ফ্রেমবন্দি। তাদের মুখে কোন সংলাপ নেই। ছবি এক লাস্যময়ী তরুণী। বেশীদিন কোন স্বামীর কাছে ঘর করতে পারেনি। তার মতে একসঙ্গে সারাজীবন কাটাতে গেলেও স্বামীকে অন্ধ হতে হবে, না হলে স্ত্রীকে বোবা হতে হবে। সে (ছবি) চারটি বিয়ে করলেও মনের মতো বর খুঁজে পায় না। প্রথম বর নন্তকে পছন্দ হয় না কারণ সে কেরাণির বেশি টাকা নেই। দ্বিতীয় বর নন্তর বন্ধু বান্টির টাকা প্রচুর কিন্তু নন্দদুলালের মত কচি নয়। আবার উকিল সরলকান্তি ভালো হলেও বেজায় মোটা, তাই পঞ্চম বার পছন্দসই বর পেতে আগ্রহী। সে নিজেই জানে না ঠিকঠাক বর পাবে কিনা। কোন মানুষ নিজে জানে না সে কী চায়। আসলে নাটককার বলতে চেয়েছেন কোন মানুষ সম্পূর্ণ নয়। এটা যে মানতে পারে না তার জীবনে সুখ আসে না। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় হাসির মোড়কে জীবনের এক গভীর সত্যকে পরিস্ফুট করেছেন অণুনাটকটির মধ্য দিয়ে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ২০০৮ সালে 'খরস্রোত' অণুনাটকটি গণনাট্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাধু, গনেশ, দত্তবাবু, প্রথম যুবক, দ্বিতীয় যুবক, ভিখিরি, রাতুল ও রঘু এই চরিত্রগুলির সংলাপে তিনটি দৃশ্যে নাটকের কাহিনি পরিণতিতে পৌঁছায়। নাটকের কাহিনি সহজ সরল। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রাধু যার বয়স চল্লিশ বছর সে গনেশ নামের এক প্রতিবেশীকে নিয়ে অ্যাডভোকেট দত্তবাবুর বাড়িতে আসে কিছু সাহায্যের আশায়। গণেশ হালদার নামে একটি সৎলোক, সৎভাবে রাস্তার ধারে বসে ছাতা সারাইয়ের কাজ করে। সে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ছেলের খুব অসুখ, চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকার দরকার তাই তাকে সঙ্গে করে ধনী দয়ালু পরোপকারী দত্তবাবুর কাছে নিয়ে এসেছে রাধু। এর আগে রাধু নানা ছলা কলায়, কেঁদে কেটে অনেকবার দত্তবাবুর কাছে থেকে টাকার সাহায্য লাভ করেছে। গনেশকে দত্তবাবু তার ছেলের চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা সাহায্য করতে চাইলে সে নিতে পারে না। সে চায় তার যোগ্যতায় কোনো একটা কাজ যার দ্বারা সে মাসিক আয় করে ছেলেকে বাঁচাতে পারে। সে অসৎপথ অবলম্বন করতে পারে না। দয়ার পাত্র হয়ে নয় নিজের যোগ্যতা দিয়ে বাঁচতে চায় সে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় গনেশকে দুটি যুবক ধরে নিয়ে একটা পার্কের বেঞ্চে বসায়। যুবক দুটি জানতে চায় কেন গনেশ ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলে দুটি গনেশকে ভুল বোঝে। তারা ভেবেছিল গনেশ হয়তো আত্মহত্যার জন্য রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনাক্রমে গনেশ জানায় আসলে রেল লাইন পার হতে গিয়ে এক ব্যাক্তির টাকা ভর্তি একটা মানিব্যাগ পড়ে যেতে দেখেছে। এতক্ষণ সে তা নিয়ে নানা রকম চিন্তা করছিল কী করবে সে ঐ মানিব্যাগটা নিয়ে। সে পাপের পথে যাবে অর্থাৎ মানিব্যাগের টাকাগুলো নিয়ে ছেলের চিকিৎসার ওষুধ কিনবে, না কী যার ব্যাগ তাকে ফিরিয়ে দেবে অথবা থানায় গিয়ে জমা দিয়ে আসবে। গনেশের কথা শুনে ছেলে দুটি তাকে বাড়িতে গিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে। পার্কের বেঞ্চে বসে থাকা ভিখিরিও তাকে তাকে টাকাটা নিয়ে ছেলের চিকিৎসার করার কথা

বলে। কিন্তু গনেশ তা করতে পারে না। তাই তৃতীয় দৃশে দেখা যায় সে রাতুল নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয় সেই মানিব্যাগটা নিয়ে। মানিব্যাগটা পেয়ে রাতুল খুশি হয়ে তাকে পুরস্কার দিতে চাইলে সে না নিয়ে তার নিজের যোগ্যতায় একটা কাজে প্রার্থনা করে। গনেশের আচরণে ও কথায় খুশি হয়ে রাতুল একটা কাজের দেওয়ার কথা বলে সঙ্গে অনেক মাইনে ও প্রয়োজনে ছেলের চিকিৎসার ভালো ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কাজটিতে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে সত্ত্বেও গনেশ রাজী হয়। অণুনাটকটিতে নাটককরা মোহিত মানুষের মধ্যে নিজের যোগ্যতা অনুসারে সংগ্রাম করে এবং সৎভাবে বাঁচার অদম্য ইচ্ছাশক্তির জয়গান করেছেন। একই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন সহজ সরল সৎ ভালো মানুষের কাছ থেকে ছলনার আশ্রয়ে কিভাবে অসৎ প্রকৃতির মানুষগুলি কিভাবে থাদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। লোভ, লালসা, ছলনা মিথ্যাচার প্রভৃতি অমানবিকতার খরস্রোতে গা না ভাসিয়ে কঠোর সংগ্রাম করে নিজের যোগ্যতায় সৎভাবে বাঁচার জীবন্ত আলেখ্য এই নাটক।

২০০৯ সালে শারদীয়া সংখ্যায় 'গণনাট্য পত্রিকায়' মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্টারভিউ' অণুনাটকটি প্রকাশিত হয়। পরে এই অণুনাটকটি 'ঋতবীণা' পত্রিকার ৯ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৩ (স্মরণ সংখ্যা) সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়। অফিসার, বেয়ারা ও একজন চাকুরীপ্রার্থী মেয়ে – এই তিনটি চরিত্র নিয়ে অণুনাটকটির কাহিনি গড়ে উঠেছে।। অণুনাটকটির বিষয়বস্তুতে নাটককার মোহিত বর্তমান সমাজের এক নগ্ন রূপ তুলে ধরেছেন। বাইশ তেইশ বছরের একজন চাকুরী প্রার্থী মেয়ে একটি বড় মার্কেটিং ফার্মের executive officer এর অফিসে আসে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। সে ইন্টারভিউর সময় পর্ব পেরিয়ে যাওয়ার পর অফিসে আসে এবং কোনভাবে তার ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। অফিসার বলেন সময় মতো সে না আসার জন্য তার আবেদনপত্রটি বাতিল ফাইলে চলে গেছে, এখন কিছু করার নেই। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা, সে জানায় তার চাকরিটা ভীষণ জরুরি। তার বাড়িতে বাবা, মা

আর একটি ছোটবোন আছে। তার বাবা হার্টের পেসেন্ট। মেয়েটি জানায় হঠাৎ করে তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাক্তার ডেকে ওষুধ, ইন্‌জেকসন এনে তারপর সে বাড়িতে বেরিয়ে এসেছে। তাই সে সময় মতো পৌঁছাতে পারেনি। সে অনুরোধ এই রকম পরিস্থিতিতে তাকে যদি একবার ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। অফিসার মেয়েটিকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে ইন্টারভিউ দিলে যে চাকরি হবে তার কোন মানে নেই। এটি সেলসম্যানের চাকরিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে লড়াকু মনোভাবটাই বেশি দরকার। তাছাড়া অফিসার মেয়েটিকে বোঝান যে Largest Marketing Firm এর discipline-টাই আসল কথা। ঘটনাক্রমে অফিসার মেয়েটিকে অফিস থেকে চলে কথা জানায়। মেয়েটি অনেক অনুনয় বিনয় করে তাকে consider করার জন্য। কিন্তু অফিসার কোনো কথা না শুনে মেয়েটিকে বেরিয়ে যেতে বলে। মেয়েটি ব্যাগটা রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যায়। অফিসার মেয়েটির ব্যাগটা ছেড়ে গেছে দেখে বেয়ারাকে মেয়েটির ব্যাগ দিয়ে আসার কথা জানায় এবং সেই সঙ্গে বেয়ারাকে তিরস্কার করে ঠিকভাবে সে তার দায়িত্ব পালন না করার জন্য। বেয়ারা ব্যাগটা না নিয়ে জানায় ব্যাগে মেয়েদের অনেক মূল্যবান সম্পদ থাকে তাই তারা ভুলে গেলেও খানিক পরেই ফিরে আসবে তা নেওয়ার জন্য। একটু পরেই মেয়েটি ওফিসে ঢোকে ব্যাগটি নেবার জন্য। ব্যাগ নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে সময় সে জানায় বাথরুমে তার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল তাই চোখে মুখে একটু জল দিয়ে ফিরে এসেছে। অফিসার মেয়েটিকে একটু সময় বসে বিশ্রাম নেবার কথা জানায় মানবিকতার খাতিরে। মেয়েটি তখন জানায় যে সে বাথরুম থেকে শুনেছে এই ইন্টারভিউ দু’দিন হববার কথা। মেয়েটি অনুরোধ করে দ্বিতীয় দিনে তাকে যাতে একটা সুযোগ করে দেওয়া যায়। অফিসার জানায় তার আবেদনপত্র বাতিলে ফাইলে চলে গেছে তা ফিরিয়া আনা সম্ভব নয়। মেয়েটির কাছে থাকা আবেদনপত্রের ডুপ্লিকেট কপি জমা নেওয়ার অনুরোধ করে। শেষ পর্যন্ত অফিসার ডুপ্লিকেট আবেদনপত্রটি টেবিলে রেখে যাওয়ার কথা জানায়

মেয়েটিকে এবং বিকেল পাঁচটার মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে তাকে দ্বিতীয়দিন ইন্টারভিউতে তাকে আসতে হবে কিনা। মেয়েটি বেরিয়ে গিয়েও আবার অফিসে আসে আবেদনপত্রে দেওয়া ল্যাণ্ড নম্বরের বদলে দু'দিন আগে কেনা নতুন মোবাইল নম্বরটা দেওয়ার জন্য। অফিসে ঢুকে আড়াল থেকে মেয়েটি দেখতে পায় তার আবেদনপত্রের ডুপ্লিকেট কপিটা দলাপাকানো অবস্থায় ওয়েস্ট পেপার বক্সে পড়ে আছে। মেয়েটি তা দেখে মোবাইল নম্বর দেওয়ার আগে অফিসারকে বলে : "আপনি জানতে চেয়েছিলেন আমি চাকরির কাজে Fighter হতে পারি কি না। আমি ওয়েস্ট পেপার বক্স থেকে (দলাপাকানো কাগজের গোল্লাটা তোলে) আমার application টা এই তুলে নিলাম। এটা আমি এখন আপনার গায়ে ছুঁড়ে মারতে পারি। (ওর গায়ে ছুঁড়ে মারে) I can be a fighter এবার আপনি কি পারেন করুন। [রুদ্ধবাক অফিসার বিমূঢ়ভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঘন ঘন টেবিল-বেলটা বাজাতে থাকে।] এইভাবে নাটকটি শেষ হয়। নাটককার এই অণুনাটকটির মাধ্যমে বর্তমান সমাজে চাকরি দেওয়ার নামে যে প্রবঞ্চনা ঘটে চলেছে তার এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে অসহায় বেকার কর্মপ্রার্থীদের প্রতিবাদী সত্ত্বা জাগরিত করার চেষ্টা করেছেন।

গণনাট্য পত্রিকায় ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর অনবদ্য অণুনাটক 'কাঁথা'। এই অনুনাটকটিতে হৃদয় ভিত্তিক শক্তির অসামান্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুটি মাত্র চরিত্র রয়েছে নাটকে– বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা ছেলেটি এবং বুড়িমা। ছেলেটির চাকরি নেই, অভাবের সংসার নিয়ত গঞ্জনা শুনে একদিন সব ছেড়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পার্কে দেখা হয় এক বুড়িমার সঙ্গে। তার সংসারে কেউ নেই। সব প্রিয়জনই ছেড়ে গেছে বৃদ্ধাকে। কেউ মারা গেছে, কেউ চলে গেছে অনেক দূরে। কাউকেই আটকাতে পারেনি সে। কেবল মনে মনে আঁকড়ে আছে সে তার আত্মীয় স্বজনদের। এমনই করে কঠিন বাস্তবকে অতিক্রম করে যায় মানুষ মনেরই শক্তিতে। কল্পনায় সে তার নাতিকে কাঁথা জড়িয়ে ঘুম পাড়ায় । স্বামী ছেলে-বউ নাতির ফেলে

যাওয়া কাপড়-চোপড়ের টুকরো দিয়ে সে কাঁথা বুনেছে। টুকরো কাপড়ের স্মৃতির মধ্যেই সবাইকে কাছে পায় বৃদ্ধা। 'সব ঘরে পড়ে থাকা ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়। এই যে সাদা সাদা টুকরোগুলো কত্তার পরণের ছেঁড়া ধুতি কেটে নিয়েছি, রঙিন কাপড়ের টুকরোগুলো বৌমার, এগুলো আমার ছেলের শার্টের আর এগুলো আমার নাতির ইজের আর কাঁথার ফালি এই কাঁথাটি গায়ে দিলে মনে হয় আমার সংসারে সবাই আছে, আমার গায়ে জড়িয়ে আছে।... কে কোথায় ছেড়ে চলে গেল— আমি তো ছাড়তে পারি না। সব যায়, বাবা মায়া যায় না।' মাতৃ মনের এই অনুভূতির প্রকাশ ছেলেটির সত্তাকে জাগ্রত করে। সে শেষ পর্যন্ত মায়ের কান্নায় সাড়া দিয়ে বাড়ি ফিরবে মন স্থির করে। সে বৃদ্ধার প্রতি সহানুভূতি পরায়ণ হয়ে ওঠে। বৃদ্ধাও তা উপলব্ধি করে এবং সেজন্যই ছেলেটির কাছে ক্ষমা চায় আর বলে তোমার ফেলে দেওয়া সাটের একফালি কাপড় আমার এই কাঁথার গায়ে সেলাই করে গেঁথে নেব। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটক মানুষকে জীবনের থেকে পালিয়ে নয় জীবনের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে শেখায়। প্রতিটি মানুষকে প্রতিদিন লড়াই করতে হয় কোন না কোন ভাবে। জীবন কখনও পরাজিত হয় না। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ নাটকেই মানুষের সততা ও প্রাণশক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। কাঁথা নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

২০১০ সালে অণুনাটক সমাচার পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত অণুনাটক 'পোকা মাকড়ের কুটুম' প্রকাশিত হয়। এই নাটকে নাটককার সমাজের অন্ত্যজ, ব্রাত্য, প্রান্তিক, শোষিত শ্রেণির মানুষের মর্মন্তুদ জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। সভ্য সমাজ থেকে যারা বহু দূরে আস্তাকুড়ের নোংরা ঘেঁটে যাদের জীবন নির্বাহ হয়, যাদের চোখের জলের কোন দাম নেই। সারাদিন শহরের বিভিন্ন ডাস্টবিনে জঞ্জাল ঘেঁটে বেড়ায় কাতু ও হাসির মতো সমাজের অপাংক্তেয় চরিত্ররা । সারাদিন ভাঙা বোতল, ক্যান, লোহালক্কড় কুড়োয়। কেউ এদের মানুষ বলে মনে করে

না। এদের ভোটাধিকার, রেশন কার্ড, এমনকি থাকার জায়গাটাও এদের নেই, এরা সমাজের জঞ্জাল। এদের মৃত্যু হয় ভদ্র সমাজের গাড়ির চাকায় পিষে যাওয়া রাস্তার কুকুরের মতো। আস্তাকুড়ের পোকামাকড়ের সঙ্গে এদের তাই আত্মীয়তা গড়ে উঠে সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে। নাটকের মূল চরিত্র কাতু সমাজ বদলে দেবার, নেতা হবার, জোট বাঁধবার স্বপ্নদেখে। কাতুর বউ তাকে ছেড়ে চলে গেলেও তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে তিন বছর আগে হারিয়ে যাওয়া পুরনো বন্ধু হাসিকে। হাসি একসময় কাতুকে ছেড়ে, জঞ্জাল ঘাঁটা কাঁধের বস্তা ফেলে হাসপাতালের এক ঝাড়ুদারকে বিয়ে করে ঘর সংসার করেছিল। হাসি তার স্বামীর দেশে থাকা বউ বাচ্চার কথা পরে জানতে পেরেছিল। তার স্বামী প্রতিদিন মদ খেয়ে বাড়িতে ফিরে হাসিকে পেটাত। হাসি বেশ কিছুদিন মার সহ্য করলেও একসময় সে আর সহ্য করতে না পেরে পুরানো বন্ধুর কাছে আস্তাকুঁড়ে ফিরে আসে। কাতুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় হাসি মনে জোর পায়। পুরনো সঙ্গী হাসিকে ফিরে পেয়ে কাতুও যেন প্রাণ ফিরে পায়। তারা দুজেন একসাথে নতুন ভাবে বাঁচতে চায়। নোংরা জীবন ছেড়ে সুস্থ জীবনে বাঁচতে চায়, তারা নিজেদের মতো সমাজকেও বদলে দিতে চায়। তারা নতুন ভাবে যখন বাঁচার স্বপ্নে বিভোর ঘটনাক্রমে সেখানে তখন হাসির স্বামী পানু হাসিকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য জন্য উপস্থিত হয়। কিন্তু কাতুর উপস্থিত বুদ্ধির কাছে হার মানে হাসির স্বামী পানু। আস্তাকুড়ে কুড়িয়ে পাওয়া একটা খেলনা ফোন দিয়ে থানায় ফোন করার অভিনয় করে কাতু। পানু ভয়ে পালিয়ে যায়। কাতু মনে জেগে ওঠে সমাজের কাছ থেকে সমস্ত দাবি আদায় করা এক জোট হওয়ার স্বপ্ন। তারা জোট-বদ্ধ হলে দাবি আদায় করার জন্য তাদেরকে আর নকল দিয়ে ভক্কি দেখাতে হবে না। তখন তাদের জোর অনেক বেড়ে যাবে। শয়ে শয়ে মানুষ তাদের সঙ্গে সমাজ বদলের মিছিলে যোগ দেবে। কাতু সমাজ বদলের চেষ্টা করে যাবে। সঙ্গে সে তার হাসিকে পেয়েছে তার আর কোনো চিন্তার কারণ নেই। সে ড্রাম বাজিয়ে আনন্দে মেতে উঠবে। কাতুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে

চারিদিক থেকে ড্রাম বাজিয়ে এগিয়ে আসা বিরাট মিছিল। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সমাজ বদলের স্বপ্ন প্রতিফলিত নাটকের চরিত্রগুলির স্বপ্নে।

'অণুনাটক সমাচার' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'মুখ' নামক অণুনাটকটি। মুখ দেখে মানুষকে বিচার করার প্রবণতা আমাদের সহজাত স্বভাব। এই স্বভাবের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় মুখের অন্তরালে থাকা মন, সুকুমার বৃত্তি প্রভৃতি বিচার না করে ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা গড়ে তুলি আমরা। মানুষ চিনতে ভুল হওয়া ও পরিণামে অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হওয়ার ঘটনা বিরল নয় মানব সমাজে। এই অণুনাটকের তিথি নামক চরিত্রটিও একইরকম ভুল করে এবং পরিণামে আফশোস করে। অণুনাটকটির কাহিনি থেকে জানা যায় তিথি একটি কাপড়ের দোকান থেকে হাজার তিনেক টাকা ও প্রয়োজনীয় বেশ কিছু কাজগপত্র সমেত পার্স হারিয়ে ফেলে। ঘটনাক্রমে কুৎসিত দেখতে ক্রিমিনাল টাইপের একটি লোকও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিথির সন্দেহ হয় সেই কুৎসিত লোকটিকে। তিথি পার্স হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা জানিয়ে থানায় নালশ করে। কুৎসিত দর্শন সেই লোকটিও থানায় উপস্থিত হয়। লোকটিকে দেখে তিথির মনে নতুন কোনো বিপদের আশঙ্কায় ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যায়। লোকটি তিথির ভয় ভাঙিয়ে তার হারিয়ে যাওয়া পার্সটা ফেরত দেয়। লোকটি জানায় পার্সটি কুড়িয়ে পেয়ে সে থানায় জমা দিতে এসেছে। লোকটা পার্সটা দিয়ে সব ঠিক আছে কি না দেখে নিতে বলে তিথিকে। তিথিও জানায় দেখার কোন দরকার নেই তার সব ঠিকই আছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে লোকটি তার স্ত্রী ও মেয়ের একটা ছবি বের করে দেখায় তিথিকে। লোকটির স্ত্রী আর মেয়ে তার কদর্য কুৎসিত মুখের মধ্যে কেবল নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর অগাধ বিশ্বাস খুঁজে পায়। কুৎসিত হওয়ার কারণে তিথির মতো অচেনা অজানা লোক তাকে বিশেষ সুবিধার নয় ভেবে সন্দেহের চোখে দেখে। লোকটি যখন নিজেই এগিয়ে এসে তিথির সঙ্গে কথা বলে তার হারিয়ে যাওয়া সবকিছু

ফিরিয়ে দেয় তখন সে তার ভুল বুঝতে পারে – মানুষকে সঠিক ভাবে বিচার করতে হলে রূপ দেখে নয় অন্তরের অনুভূতি দিয়ে মূলায়ন করতে হবে। আমাদের গতানুগতিক ধারণার মূলে আঘাত হেনেছেন নাটককার মোহিত। মানুষের মহত্ব তার বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে অন্তরের সৌন্দর্যের উপরেই নির্ভর করে - এমন এক গূঢ় ব্যঞ্জনার কথা ব্যক্ত হয়েছে এই 'মুখ' অণুনাটকটিতে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা শেষ অণুনাটক হল 'ষোলো পাতা'। অণুনাটকটি ২০০৯ সালে লিখিত ও অভিনীত হয়। সোনারপুর 'কৃষ্টি সংসদ'-এর প্রযোজনায় শিশির মঞ্চে ২০০৯ এর ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম অভিনয় হয়। পরে অণুনাটকটি 'গণনাট্য' পত্রিকায় আটচল্লিশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। দুটি চরিত্রের সিরিয়াস নাটক এটি। চরিত্র দুটি হল নাট্যকার জলি ও তার বন্ধু বিটু। নাট্যকার জলি প্রায় দু'বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটি নাটক লিখেছে যার চরিত্র সংখ্যা দুশো একটি। লেনিন থেকে শুরু করে হিটলার, নেহেরু, স্তালিন, মার্কস, ব্রেখট, গান্ধীজী, নেতাজী, বুদ্ধ, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সমস্ত মহাপুরুষেরা উপস্থিত এই নাটকে। নাট্যকার জলির দুঃখ এদেশের মানুষ এই মহানাটকের মর্ম বুঝবে না। নাট্যকার জলি অনেক খেটে খুটে অনেক কাটাকাটি করে ৩০০ পাতার নাটককে ষোলো পাতায় দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু এই ষোলো পাতার নাটককে কোনো ভাবেই সে পনের পাতায় আনতে পারছে না। নাটকে প্রতিফলিত সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র-ক্যাপিটালিজম – পৃথিবীর সব ইজম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। নাট্যকারে দৃঢ় বিশ্বাস নাটকের দুশো একটি চরিত্রের একটি চরিত্র বাদ পড়লে মহা সর্বনাশ ঘটে যাবে। তার এই 'খ্যাপার পাঁচালি' চারিদিককে কাঁপিয়ে তুলবে। কিন্তু সে এক বড় সমস্যায় পড়েছে। নাটকটি সে লিখেছে এই কানাডার বুক পাবলিশিং কনসান এর জন্য। তাদের মূল শর্ত অনুযায়ী নাটকটিকে হতে হবে মাত্র পনের পাতার। সে একজন রাইটার হওয়ার জন্য একজন মারডারার এর মতো নাটকটিকে কেটে ষোলো পাতা থেকে পনের পাতায় আনতে পারে না। নাট্যকার

তার সমঝদার বন্ধু বিটুকে ডাকে নাটকটিকে ষোলো পাতায় সাজিয়ে দেওয়ার জন্য। উদ্ভ্রান্ত দুই বন্ধু অনেকবার চেষ্টা করেও একটু বাদ দিতে পারে না। বিটু তার নাট্যকার বন্ধু জলিকে আশ্বাস দেয় এই বিস্ফোরক নাটক চারিদিকে হৈ চৈ ফেলে দেবে। ষোলো পাতার জন্য কানাডার পাবলিশিং কনসান তার নাটক না ছাপলে তারা নিজেরাই মঞ্চস্থ করবে। নাটক ভেঙে ছোট করার প্রসঙ্গে নাট্যকার জলির সংলাপ আসলে নাটককার মোহিতের নিজের ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। যখন জলি জোরালো যুক্তি দেখায় - 'মানুষের শরীরটা জন্মানো থেকে বাড়তে বাড়তে এক জায়গায় এসে থেমে যায়। তার পর জোর করে বাড়ালো যায় না, কমানোও যায় না। শিল্প এইরকম, ন্যাচারাল গ্রোথ-এর প্রোডাক্ট'।

আত্ম অন্বেষণের যাত্রায় কবি থেকে নাটককার হওয়া মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'একজন উদ্ভাবক, প্রতি মুহূর্তে নিজের মধ্যে ভাঙা-গড়ায় উৎসুক অন্বেষণী শিল্পী।' বাংলা নাটকের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর নতুন চিন্তার ফসল এই অণুনাটক নিয়ে যথার্থ অর্থে আধুনিক শিল্প প্রকরণ হয়ে উঠেছে। তাঁর এই শিল্পরূপের মধ্যে বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর সৃষ্ট অণুনাটকই নাট্যকার পরিচালক, অভিনেতা, দর্শক, পাঠকের কাছে যথার্থ শিল্পরূপ হিসেবে অধিক গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১। মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশংকর : রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব বিচার ; ১ লা বৈশাখ, ১৪১৬; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা -৯; পৃষ্ঠা -২৩।

২। তদেব , পৃষ্ঠা – ২২-২৩।

৩। (চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : নাটক সমগ্র, সেপ্টেম্বর, ২০০১; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা –৭০০০৭৩ ; পৃষ্ঠা – ১৫।)

৪। তদেব, পৃষ্ঠা -১৯।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১৫

৬। তদেব, পৃষ্ঠা -8

৭। তদেব।

৮। তদেব।

৯। তদেব, পৃষ্ঠা-২৭।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭।

১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৪।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৭।

১৫। তদেব।

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৬০।

১৭। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : নির্বাচিত নাটক সংগ্রহ, জানুয়ারি, ২০১০; নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা – ৭০০০১৪; পৃষ্ঠা -১৭৮।

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪২।

১৯। কমল দে সিকদার (সাম্মানিক সম্পাদক) : ‘প্রমা’, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ সংখ্যা ২০১৩), পৃষ্ঠা – ২১।

২০। দাস, তপনজ্যোতি (সম্পাদক) : রঙ্গপট নাট্যপত্র, মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা, ২০১২, কলকাতা – ৯২, পৃষ্ঠা – ৮১।

২১। কমল দে সিকদার (সাম্মানিক সম্পাদক) : ‘প্রমা’, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ সংখ্যা ২০১৩), পৃষ্ঠা – ১০।

২২। তদেব, পৃষ্ঠা – ১৪৪ - ১৪৬।

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৫১ – ২৫২।